৬৯ বর্ষ

পরিচয়

অন্যধারার গল্প

প্রেমচন্দ

প্রদীপ দাশশর্মা

নীহারুল ইসলাম

বিমান চট্টোপাধ্যায়

সোম মুখোপাধ্যায়

রথীন দে

রামতনু দত্ত

নাট্য আলোচনা ঃ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত

ও

অন্যান্য পুস্তক আলোচনা
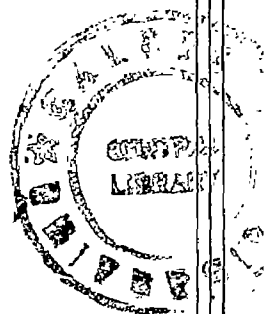
পরিচয়

মে-জুলাই ২০০০
বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৭
১০-১২ সংখ্যা ৬৯ বর্ষ

গল্প

পুস্তক সমালোচনা

নাট্য আলোচনা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, পরিচয়-এর প্রধান কর্মাধ্যক্ষ রঞ্জন ধর তাঁর বয়স ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে পত্রিকা-সংক্রান্ত তাঁর যাবতীয় দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন।

সম্পাদকমণ্ডলী
পরিচয়

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

রাবণ

প্রদীপ দাশশর্মা

ঘটনাটা যে এরকম ঘটবে, ঘটতে পারে; অমিতবিক্রম ভাবেনি আগে। তাকে কোলকাতায় মাসে ২০/২৫ দিন বা তারও বেশি, টানা, থাকতে হয়। কোনো কোনো মাসে ১ দিনের জন্যও ফিরতে পারে না। 'বিকাশ ভবন' আলো করে থাকে। মন্ত্রী বলে কথা! বিকাশ ভবনে অনেকের দপ্তর। তারও। তার ঘরের ঠিক বাইরের সার্কেলে তার সেক্রেটারি। ডান হাতে কালো ডটপেন, বাম হাতে লাল ইন্টারকম। থুতনি সামান্য লম্বা করলে গ্রে টেলিফোন। ডানপাশে লাল-ব্রা ফাইল। তারও বাইরে কাঠের পার্টিশনে পিওন ও ভিজিটরদের জন্য রাখা কাঠের হাতলওয়ালা বেঞ্চ বা সোফা। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রথমে ঐ পিওনের হাতে স্লিপ দিতে হয়। পিওন সেক্রেটারিকে। ইন্টারকমে অনুমতি আসে। তারপর ভেতরে—অদ্ভুত আঁধারে—ঢোকা। সেখানে একটা দীর্ঘ টেবিল। তার ওপারে তিনি, জনগণের নয়নের মণি। প্রথম যখন অমিতবিক্রম তার দপ্তরে ঢোকে তখন স্বভাবতই মনে হয়েছিলো টেবিল এতো চওড়া কেন! পরে বুঝেছিলো এটা দরকার। এতে যান্ত্রিক দূরত্ব হয়। যারা দেখা করতে আসেন, ভিজিটর্স, নানা দাবি নিয়ে আসেন, তাদের তেমন বড়ো লাগে না। তখন তারা মাইক্রোকজম্। ফলে তার আপেক্ষিক ব্যক্তিত্ব বাড়ে। তখন নিজের মুখের দুর্বল রেখা অস্পষ্ট। কারুর চোখে পড়ে না। তার প্রশস্ত টেবিলে ৩টে ফোন। শাদা, স্টিল-গ্রে, লাল। শেষেরটা ইন্টারকম। মাস তিনেক হলো ডবকা ছুঁড়ি ভারী স্তনের কম্পিউটার বসেছে। অমিত, মজা করে, ঐ কমপিউটারের নাম রেখেছে 'ইরা'। যে কোন ব্যাপারে বলে, এটা ইরাকে দাও, ওটা ইরাকে দাও।

আজকাল তো আগের মতো না। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা বরং সহজ। বামফ্রন্টের আমলে কিছু ডেমোক্রেসি অন্তত হয়েছে। তবে সুযোগ থাকলেও বেশির ভাগ সময়ে মন্ত্রী মেলে না। তাঁর দোষ না। তিনি মিটিঙে থাকেন। আর, মিটিং তো করতেই হবে। অমিতবিক্রম ক্যাবিনেটে। সেও প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেলো। বায়োডাটায় হয়তোবা সে মন্ত্রীসভার তরুণতমদের একজন। যোগ্যতার কারণে, না আঞ্চলিক কোটায় কে জানে! এসব হিসেব আর দলিল-দস্তাবেজ বুঝে নেওয়া এমন কিছু শক্ত না। ভোটাররা বোঝে। সেও বিলক্ষণ জানে। তবু সাবধানে থাকে। চলতে ফিরতে যেন ভুল না হয়। চালে ভুল না হয়। ভাবে, একজন মন্ত্রীর কী কী সরল ভুল, পাওয়ার

নিউক্লিয়াসে থেকে, হতে পারে, হয়। ১নং ভুল সে তার স্ত্রীকে/স্ত্রীর ভাইকে/নিজের ভাই বা ভাইপোকে চাকরি দিতে পারে বা চাকরি-তুল্য উমেদারি/ঠিকেদারি ইত্যাদি। ২নং ভুল সরকারি আবাসনের বড়োসড়ো ফ্ল্যাট বা জমির প্লট জলের দামে, লটারি ছাড়াই, আহা, ম্যানেজ করতে পারে। ৩নং ভুল, বিভিন্ন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে, মিশ্র প্রকল্পে বা অন্যত্র, ঘুঘু কন্ট্রাক্টরদের পাইয়ে দেবার অর্থনীতি করতে পারে। আর তা থেকে, মাঞ্জার অবধারিত নিয়মে, কিছুটা পার্টি ফাণ্ডে আর বেশিটুকু নামে/বেনামে রেখে দিতে পারে। স্বদেশী আমলে, যখন নাকি জাতীয়তাবোধ এক হাজার ওয়াট তখনও নাকি এসব হামেশা হতো। জিতু সেন সদরঘাট ডাকাতির টাকা থেকে বৌকে নেকলেস গড়িয়ে দিয়েছিলেন। অহো, প্রেম! হয়তো দেশপ্রেম নয়। ৪নং ভুল নিজের সাপোর্ট বেস-এর দিকে, একবার জেতার পর, ফিরে না তাকানো। পুরনো সমর্থন অটুট রাখতে হবে। নতুন সমর্থন সংগ্রহ করতে হবে। নইলে নির্বাচনের লাল ঘুড়ি ভো-কাট্টা। ৫নং ভুল, নিজের দপ্তরের কারণে, মুখ্যমন্ত্রীকে বিব্রত না করা। তাহলে ককাস থেকে ঢেউয়ের ধাক্কায় সরে যেতে হবে। ৬নং ভুল ফ্যাকশন পলিটিক্স-এ তুরুপের তাস চিনতে না পারা। শালা, জিন খসে গেলেও ঘোড়ার গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকতে হবে। পড়ে গেলে চলবে না। এইসব সেলাইয়ের দাগ অমিতবিক্রম চেনে। সে চিতা ও হরিণ—একাধারে দুই-ই। ক্ষিপ্র, সাবধানী। তার স্ত্রী জবাও এসব জানে। দুজনেই একসঙ্গে ছাত্র-রাজনীতিতে ছিলো। জানারই কথা। বছর সাতেক আগে তাদের বিয়ে হয়েছে। তারও, বছর দেড়েক আগে, নিজের যোগ্যতায় জবা স্কুলে চাকরি পেয়েছে। অবশ্য তখন খুব দু'নম্বরী হোতো। এখন স্কুল-সার্ভিস-কমিশন হওয়ায় অনেকটা কম। একেবারেই যে নেই একথা বলা যায় না। নইলে প্যানেল পাব্লিশ করা হবে না কেন! ভ্যাকান্সি কটা, কোন্ কোন্ স্কুলে, কোন্ কোন্ বিষয়ে তার তালিকা ঝুলবে না কেন? এসব তো ইণ্টারনেটে বিশ্বসংসার পর্যন্ত জানানো যেতে পারে। এসব কথা মন্ত্রী অমিতও কিছু কিছু জানে। জানলেও, করার কিছু নেই। সে শিক্ষা-দপ্তরের কেউ না। অযথা ঘোঁট পাকিয়ে লাভ কী! পার্টিতে নিজের সাপোর্টবেস বোবা আরশোল্যার মতো চেটে চেটে খেয়ে ফেলবে, এমন বুদ্ধু সে নয়।

এবারে টানা ১৯ দিন কোলকাতায় থেকে মাত্র দু'দিনের জন্য ২৫০ কিলোমিটার দূরে বাড়ি ঢুকে সে যা দ্যাখে, তা আগে আদৌ দেখবে ভাবেনি। চিলতে ডাইনিং স্পেস। দেওয়ালের এক দিকে বেশ খানিকটা জুড়ে নোনা। ফুলে উঠেছে। মন্ত্রীত্বের আড়াই বছর পরেও এখানেই তারা আসনপিড়ি খেতে বসে। বস্তুত, এই আসবাবহীন স্পেসেই একটা পেল্লায় ফ্রিজ দাঁড়িয়ে আছে। দুই দরোজা। এল. জি.। শাদা পরী। অমিতের মনে হলো তার বুকে পোলার-বিয়ারের নখ। গলা চিরে বেরিয়ে এলো।

—ফ্রিজ!

—কিনলাম। এরিয়ারের টাকা থেকে।

—এরিয়ার পেয়েছো নাকি!

—হ্যাঁ।

—ওঃ, তাই এই শাদা জানোয়ার! ভালো ভালো। টাকাটা কিন্তু পার্টিবে কিছুটা দিতে পারতে! সুবিধে হতো। সাম্নে পুর-নির্বাচন। ওরকমই তো একবার বলেছিলে!

—কেন, তুমি তো লেভি ছাড়াও পার্টিকে সবটাই দাও। আপত্তি করেছি? আমিও তো লেভি দিই। তা বলে নিজেদের কিছু প্রয়োজন নেই! নিজেদের কথা কিছুই ভাববো না...

—নিজেদের কথা। গোল্ড রাশ। কী চাও তুমি! পণ্য?

—হ্যাঁ, ওসব কিছু কিছু লাগে সংসারে।

—১০০ কোটির বেশি ভারতবাসীর মধ্যে বড়ো জোর, টেনে-হিঁচড়ে ২৫০ মিলিয়ন মধ্যবিত্ত এদেশে। এদের মধ্যে আবার মাত্র ৩৫ মিলিয়নের মাথা গোঁজার আস্তানা। তাদের মধ্যে সামান্য কিছু লোক ফ্রিজ কেনার স্বপ্ন দ্যাখে। সাকুল্যে তিন মিলিয়ন ফ্রিজ বিক্রি হয়। ছড়িয়ে আছে অসংখ্য রঙীন কোম্পানি। গোদরেজ, কেলভিনেটর, অলউইন, ভোল্টাস, লিওনার্দ...। এখন আবার জুটেছে হোয়ার্লপুল—আইস আইস বেবি, এল. জি...। বিদেশি কর্পোরেটদের শুঃ. শুধু হেল্প করছো জবা। গরমে কুজোর জল যথেষ্ট। মদ তো খাই না যে আইস-কিউব লাগবে। ফ্রিজে কী রাখবে! পুরনো চটি, খালি শিশিবোতল! নাকি আপেল, আঙুর, সস, ডিম, হ্যাম, চিকেন, কনিয়াক...। টেল মি।

এসব বাক্যে জবার চোখে জল। দুমদাম পা ফেলে সে রান্নাঘরে। ভয় পেয়ে ওদের একমাত্র সন্তান ডিংকা জোরে জোরে পড়তে থাকে—'ঘন মেঘ বলে ঋ, দিন বড়ো বিশ্রী...।' হঠাৎ থেমে, বাবাকে জিজ্ঞেস করে, 'মেঘ কি কথা বলে, বাবা!' অমিতবিক্রম জবার মুখে মেঘ দ্যাখে। সে আজ সারাদিন কথা বলবে না। কিছু উঁচু গলায় ছেলেকে জবাব দেয় ঃ 'মাঝে মাঝে বলে বাবা, খু-উ-ব রেগে গেলে গর্জন করে, বকে, শোনো নি!'

বিজয়দা, কমরেড বিজয়দা একবার হেসে বলেছিলেন পরিবর্তনের সাম্নে কোনো ব্যারিকেড হয়না অমিত। পরিবর্তনটা পরিমাণগত থেকে গুণগত। তখন তার বেজায় জোশ। তোমার চারপাশে টি. ভি., ফ্রিজ, কম্পিউটার, ফোন, মিক্সার, মাইক্রোওয়েভ, মারুতি এইট হান্ড্রেড—তুমি কি ইডিওলজির ছাকনি দিয়ে ওগুলি বাদ দিতে পারো! সবটাই পারো! পারো না। ওগুলি তোমার ভেতরে ঢুকে গেছে। তোমার ব্যক্তিগত ওয়াড্রোবে। সামর্থ এলেই

ওগুলি তোমার। নইলে তোমার না। ক'বছর আগে ক'জন মধ্যবিত্ত বাড়িতে ফোন ব্যবহার করতো? অথচ এখন? ধরো তোমার অফিসিয়াল ফোনটা যদি এখন তুলে নেওয়া হয়, তুমি ছাড়তে পারবে! চীনে তো সাইকেলে ডেপুটিরা এন. পি. সি.তে যোগ দিতে যায়। তুমি গাড়িতে ঘোরো। ঘুমের ঘোরেও ঠিকঠাক রিসিভার হাতের মুঠোয় চলে আসে। ঠিক না! তবে, স্বীকার করি, কনজিউমারিজম্ একধরনের জলবিছুটি। যতক্ষণ না পাচ্ছো গা চুলকোবে, পেলেও চুলকোবে। আরো কিছুর জন্য। তবু মনে রেখো, যা কিছুই করো না কেন, তুমি পার্টিম্যান, কর্মী। ওসবে ভেসে গেলে পার্টির কাঁচকলা। তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ডাস্টবিনে।

অমিত জানে পার্টির জন্য কমরেড বিজয়দার ত্যাগের তুলনা নেই। ভেতরে ভেতরে নিজেকে সে বারবার জিজ্ঞেস করেছে, 'কী হে মায়ের গোপাল, পার্টির জন্য জীবন দিতে পারো!' ওম্নি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এসেছে ঃ 'পাগল'! নিজের ভেতর থেকে উঠে আসা এসব উত্তরে অমিতের যথার্থ মন খারাপ হয়। তবু ভাবে, মরে গেলে কী হবে! ডিংকার জন্য বাঁচতে হবে। পরমুহূর্তে মনে হয় এ একধরনের কপটতা। সে তো কোলকাতায় থাকে। ডিংকার সব হ্যাপাই তো সামলায় জবা। সে আর ডিংকার জন্য কীইবা করেছে! শুধু এক রাত্রির দুর্বলতা ছাড়া!

মন্ত্রী হবার পর, অমিতবিক্রম আরো বেশি করে বোঝে কিছু করে উঠতে পারবে না সে। আমলাতন্ত্র ভাঙার কথা পার্টিতে বলা আছে। সে তো প্রায় কথার কথা। ঐ লোহার ভীম চূর্ণ করবে কে! অমিত জানে, সে কোনো ভুল করতে পারে না। আসলে সে, অমিতবিক্রম চৌধুরি, মন্ত্রী মশাই, কিছু করেন না, তাই ভুলও করেন না। দি কিং ক্যান ডু নো রং। যা কিছু করে সবই ঐ আমলারা। তারাই সরকার চালায়। একজন মন্ত্রীর পক্ষে একজন আমলাকে কাবু করা প্রায় অসম্ভব, তো কেতাবে যে কথা লেখাই থাকুক না কেন! আগের আমলারা ছিলো প্রকৃত ইগুয়ানা। রং বদলাতো। যে পার্টি সরকারে, তারা তাদের। এখনকার আমলারা মন্ত্রীর জামা নিজেদের ইচ্ছে মতো বানিয়ে দেবে। মন্ত্রীকে পরতে হবে।

দুপুরে অমিত খেতে বসেছে। আসন পিঁড়ি। পাশে ডিংকা। কলাইডালের সঙ্গে স্বর্ণমোচা পেয়ে অমিত খুশি। সঙ্গে আলু পোস্ত আর ছোটো মাছের ঝোল। মন্ত্রীর বাড়ি হলেও রোজ মাছ থাকে না। বেশির ভাগ দিন ডিম থাকে। তাও একটা ডিমসেদ্ধ সুতো দিয়ে বিশ্বস্ত দু'খণ্ড করা। সুতো দিয়ে টানলে সেদ্ধ ডিম শব্দহীন ভাগ হয়ে যায়। কোনো দাঙ্গা হয় না। টের পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ছোটো মাছে ডিংকা বিরক্ত। বিব্রত। অমিতকে জিজ্ঞেস করে ঃ

—মাছে কাঁটা থাকে কেন, বাবা?

—আমাদের শরীরের ভেতরে যেমন হাড় থাকে, মাছেরও...

—ছোটো মাছে বেশি কাঁটা কেন বাবা?

—চুপ করো তো, খাও। কাঁটা বেছে দোবো?

—না, আমি পারবো।

ডিংকার বিক্রমে খুশি হলো অমিতবিক্রম। সে জানে জীবন বিজ্ঞান হতে পারে, জীবনযাপনের সবটাই বিজ্ঞান নয়। একটা মানুষের জেদ তার নিজস্ব ব্রত। কী দিয়ে এর ব্যাখ্যা হতে পারে, ভেবে পায় না সে। শুধু বোঝে, এই জেদ কখনও ভালো, কখনও বা খারাপ। ডিংকার এই জেদ ভালো, জবার ফ্রিজ কিনে ফেলা ও তা নিয়ে জেদ ধরে রাখা খারাপ।

রাতে লোকাল-কমিটির জরুরি বৈঠক সেরে ফিরলে, ঘাম জবজবে শরীরে, স্নান করে সে। হাল্কা নীল চেয়ারে বসলে জবা কাচের গ্লাসে শাদা ঠাণ্ডা লস্যি দেয়।

—আঃ, দারুণ, টপ ক্লাস, শরীর জুড়িয়ে গেলো।

—বুঝলে তো, ২৫০ লিটার।

—কী বলছো! ২৫০ লিটার! অ্যাতো কী হবে! পাগল নাকি!

হেসে ফ্যালে জবা

—আরে না, না, ২৫০ লিটারের এল. জি., ডাবল ডোর, অ্যাক্টোকার্বো ডিওডোরাইজার।

—ওহ্, সেই ফরেনার, যাকে ঢোকানো হয়েছে। বইয়ের আলমারিটা ওখান থেকে বাইরের বারান্দায় রেখেছো কেন? নষ্ট হয়ে যেতে পারে। Now পত্রিকার অনেক পুরনো সংখ্যা আছে ওতে। কতো ইমপর্ট্যাণ্ট ডকুমেণ্টস...সমর সেনকে চেনো!

—রাখো, রাখো। একসময় ওসব ওল্টাতে। এখন ছোঁও না পর্যন্ত। ফেলবেও না, বিক্রিও করবে না, দানও করবে না। জমিয়ে রাখবে শুধু। তুমি কী ভেবেছো বড় হয়ে ডিংকা ওগুলো পড়বে! ছাই।

অমিত উত্তর দেয় না। আসলে রাত্রিটা সে নষ্ট করতে চায় না।

* * * * * * * * * * * * * * * *

বাইবেলে আছে, 'পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করিও না, কারণ উহা ঘুণ ও মরিচা ধরিয়া শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং তস্কর চুরি করিয়া লয়।' অমিতের, মাঝেমধ্যে মনে হয়, সে কী ক্রমশঃ নিস্পৃহ, নির্বিকার! সংসারের প্রতি তার কী কোন দায় নেই, কমিটমেণ্ট! ডিংকার জন্য যা কিছু করার সে তো সবই জবা করে বা করে না। সে কী মন্ত্রী বলেই জগন্নাথ! কিছু করে না। তবু দিনে প্রায় ১৫/১৬ ঘণ্টা জনগণের সঙ্গে, জনগণের কাছে। বকুল কী তবে

এই জনগণের অংশ নয়! অন্তত মাইক্রোসকপিক পার্ট! সে শুধু মাসে বার দুয়েক আসে কোলকাতা থেকে। তাও সাকুল্যে ৪/৫ দিনের জন্য। হাঙরের মতো জবার শরীর খেয়ে কোলকাতায় ফিরে যায়। যেন জবা ফাস্ট ফুড। শুধু, মাঝখানে, প্যাকেট খোলার খচ্‌মচ্ শব্দের মতো ডিংকাকে নিয়ে, সংসার নিয়ে, জবার স্কুল নিয়ে মৃদু কথাবার্তা। অবশ্য জবার ব্যক্তিত্বে একটা ধার আছে। তার আয়ত চোখ, দীর্ঘ চুল, শার্প প্রোফাইল অমিতকে কোথাও যেন অবশ করে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই। সহপাঠি তারা। সার্টিফিকেটে যা আছে তাতে জবা অমিতের চেয়ে ৪ মাসের বড়ো। জবাকে তাই, কখনও কখনও অমিত স্পর্শ করতে পারে না। উজ্জ্বল ইস্পাত-পিঠে সে পাশ ফিরে জেদী শুয়ে থাকলে তাকে ফেরানো যায় না। এই যেমন সে কাল ছিলো। ফ্রিজ নিয়ে অতো কথা না বল্লেই হতো! রাতে শুয়ে, মূর্খের বিক্ষোভে, একবার ধ্বনিত হয়েছিলো, 'Lay not up for yourself treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt...'। নিজের রূপ নিয়ে তুমি দূরে থেকো না জবা। সময় এক ঘুণপোকা। খেয়ে ফেলবে তোমাকে। তাঁর ঠোঁট তখন নীলাভ। দুই ঠোঁটে রমণ-এফেক্ট। জবা ফ্রিজ হয়ে রইলো সারারাত। L. G. ৷ লুজিং গ্রাউণ্ড! হাঃ। ফলে রাতে অমিত অনেকক্ষণ জেগে রইলো। শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লো। "Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on..." ডিংকা পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে।

কোন জিনিষ বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষের প্রতিক্রিয়া একই রকমের নাও হতে পারে। তবু ঐ সব বর্ণালী অভিজ্ঞতার সারাৎসার বস্তুত যে কোনো ১টা পয়েন্ট ঘিরে পিঁপড়ের মতো জড়ো হয়। অমিত ভেবেছিলো জবা অন্তত ব্যাপারটা বুঝবে। একটা সামান্য ফ্রিজ কিনতে কেন সে বাধা দেয়! এ শুধু ওজোন ডিপ্লিশন না, একজন সংগ্রামী মানুষের, রণরক্তসফল মানুষের মর‍্যাল ডিপ্লিশনও। আসলে এই ভোগসমাজ কীভাবে তাদের দুজনকে একবার খেয়ে ফেলবে, উগড়াবে, ফের খাবে—গজভুক্ত কপিত্থ—একথা সে বোঝাতে পারে না। বিনা সুদে কিস্তিতে ফ্রিজের দাম শোধবার যে সুযোগ বাচ্চু আগরওয়াল দিলো তার ফয়দা সে কী অন্যভাবে নেবে না! এভাবে ফ্রিজ কেনার যে অর্থ অমিত করে, জবা তা করে না, করতে চায় না। জবা বলে আমি প্রথমে জবা, পরে অমিতবিক্রমের স্ত্রী, মন্ত্রীর কেউ না কারণ মন্ত্রী তো কোনো স্থায়ী ব্যাপার না। ফলে ঐ ফ্রিজ কেনা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতান্তর। এখানে জবা—জবা, অমিতবিক্রম বস্তুত বিক্রমহীন। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কেন এই কেব্‌ল-কল্ট অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেও তা ধরতে পারে না অমিত। আসলে মন দেয় না। মন দেবার মতো অবসর নেই। সময়কে কে আর

ভয় করে না! শেযে, দুর্ভেদ্য লজিকে অমিত ভাবে, সম্পর্ক থাকলে ক্ষতচিহ্ন থাকবে। প্রত্যেকের চলাচলের একটা ঊর্ণাজাল থাকে। অপরের পক্ষে সে পথে চলা সম্ভব না। তখন chaos হয়। অমিতের এরকম প্রায়ই হয়। এই chaos আবার দুরকমের। যেমন জবার সঙ্গে প্রথম আলাপের পর তার কথাবার্তায় এরকম chaos হতো। বিশেযত জবার মসৃণ গ্রীবা ও কঠিন বুকে যখন তার চোখ। বিয়ের পর, নগ্ন নির্জন মুহূর্তে মাঝে মাঝে এরকম chaos যে হতো না, তা নয়। জবা অ্যাকটিভ পার্ট নিলে তবে সব কিছু রেণু রেণু। ঐ রেণুতে তার চোখ অন্ধ। তখন ভাষা থাকতো না, অক্ষর থাকতো না, সাউণ্ড। কিন্তু অধুনা এই chaos ভিন্ন রূপের। বিছানায় দুজন নগ্ন শুয়ে থাকলেও, গত রাতে, মৃদু আলোয়, অমিত ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় জবার কোনো ছায়া, নিজের ছায়া দেখতে পায়নি, যা কয়েকবছর যাবত দেখে আসছে। অভ্যস্ত বিছানা থেকে জবা উঠে গেলে অমিত দর্পণে নিজের ছায়া ফিরে পায় ও একখণ্ড বরফের মতো শুয়ে থাকে। তার মনে হয় জবা কে? জবা প্যারাসাইটের প্যারাসাইট! সে দাসেরও দাস! না জবাকে তা বলা যাবে না। সে নিজেই নিজের ব্রেডআর্নার। বরং অমিত একটা খসখসে ডুমুরের পাতার ওপর ভাসছে। চারদিক জল। জনগণ না চাইলে ডুববে।

দাম্পত্যজীবন একধরনের assembly line। গাড়ির এঞ্জিন যেন বা! ফোর্ড সাহেবের ইনফ্লেক্সিবল্ টেকনোলজি। এখানে ওয়েলফেয়ার ইকনমিক্স চলে না। ছাড় দিতে গেলে সবটাই আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে পারে। এখানে সমাজতন্ত্র নেই, পুরনো পুঁজিবাদ—তাও নেই। যা আছে তা commodity aesthetics। প্রভু, ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল। অথচ অমিত মনে করে প্রত্যেক মানুষের একটা গমনবিন্দু থাকে। সঠিক বিকল্প বেছে নিতে হয়। সব কিছু একসঙ্গে তো পাওয়া যায় না। মধ্যবিত্তরা পায় না। কামনা করে মাত্র। ঝুঁকি পর্যন্ত নেয় না। তাকে বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে সেরা বিকল্প বা দ্বিতীয়/তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম সেরা বিকল্পটি বেছে নিতে হয়, নিতে জানতে হয়। অন্যান্যরা কত আগে, কী বেছে নেবে, তার ওপরেও অনেক কিছু নির্ভর করে। অমিত হতাশ। শেযঅব্দি জবা একটা ফ্রিজ বেছে নিলো! চিলড্রেনস্ এনসাইক্লোপেডিয়া নিতে পারতো ডিংকার কথা, তাদের সন্তানের কথা ভেবে।

অনেক রাতে বুদ্ধদেবের জরুরি ফোন পেয়ে, পরদিন ভোরে অমিতকে নিজের এলাকা থেকে, জবা থেকে, ফিরে আসতে হয় কল্লোলিনী কোলকাতায়। ডিংকা টেরও পায় না। ঘুমিয়ে থাকে। ঐ রাতেও জবা কাছে আসে না। বলা ভালো, জবার শরীরের কাছে সে যায় না। মনের কাছে না গিয়ে শরীরের কাছে গেলে আনন্দ হয় না, সে জানে। এদিকে রাজনীতির ঘোঁটও কম না।

তৃণমূল কংগ্রেসের ১টা অংশকে ফুসলিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীত্বের টোগ—সে কী ছেড়ে দেওয়া যায়! অর্ধমৃত মাছের কান্‌কোর ওপর এক মেছুনি আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল ছেটাচ্ছে, পাখনা নড়ে উঠছে, ফের চুপ। আসলে ক্ষমতা পেলে ঐ মাছও উড়ুক্কু তবু, অমিত টের পায়, ব্যক্তি নয়, একটা বিরোধী ব্যবস্থা বাম দুর্গে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। তাদের আরও সন্তর্পণে এগুতে হবে। জনগণের সঙ্গে আঠা হয়ে থাকতে হবে। জবার কাছে থাকতে হবে। হায়, গুরুদাসের মতো লোকও হেরে গেলো।

বাচ্চু আগরওয়াল মানুষ না পেঙ্গুইন! শরীরের পালক থেকে জল/তুষার সবই ঝরে যায়। কিছুই লাগে না। নোতুবা এই সেদিন অমিতবিক্রম তার ডাকে রেসপণ্ড না করলেও সে হাসে। দোকানে জবা পা রাখলে খুশি হয়। 'আসুন, আসুন ভাবিজী বলে' ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাজানো দোকান। দিনের বেলাতেও ফ্লুরোসেন্ট আলো। কোথাও কোনো ছায়া নেই। পড়ে না। জবা আজ মায়না পেয়েছে। বাচ্চুর দোকানে এসে সে সন্তর্পণে পার্স খোলে। ফ্রিজ যে হায়ার-পার্চেসে কেনা হয়েছে একথা সে অমিতকে জানিয়েছে'। শুধু বলেনি এরিয়ার থেকে দুহাজার চিপ্‌স সে নির্বাচনী তহবিলে দেবে বলে সরিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে করেই বলেনি। বাচ্চুর নির্দেশে, চোখের পলকে, 'স্লাইস' এলো। ভীষণ ভ্যাপসা গরমে, স্কুল ফেরত ক্লান্ত জবা 'না' করতে পারলো না। স্ট্র দিয়ে টেনে নিতে গলায় লেগে কাসলো খানিক্ষণ। কিছু পরে সব ঠিক হয়ে গেলে বাচ্চু বললো—'ভাবিজী এদিকটা দেখুন, নোতুন মাল, L. G. ওয়াশিং মেসিন। সাউথ কোরিয়ার। এপ্রিলের কনসাইনমেণ্ট। এখন তো সদ্য জুন। ফ্রেশ। অসাধারণ। না, না, আপনাকে নিতে হবে না। একবারটি দেখুন। গায়ের রং দেখেছেন! ততক্ষণে বাচ্চুর মুণ্ডু ওয়াশিং মেশিনের ভেতরে। কনিষ্ক। এবার হয়তো জবারও মাথা কাটবে। 'ভাবিজী, ক্লিনিং ও ড্রাইং-এ আ ফিউ মিনিটস্। সেভেন ইয়ারস ওয়ারাণ্টি। জয়া 'ভালো' বলে কোনো রকমে পিছলে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। বাড়ির কাছাকাছি মোহনের দোকান থেকে চিল্‌ড 'জাম্প-ইন' কিনলো। ডিংকার জন্য। বাড়ি ফিরে দ্যাখে ডিংকা ওয়েবেলের ছোটো ব্ল্যাক-অ্যাণ্ড-হোয়াইটে আঠা। ইণ্ডিয়া-পাকিস্থান ক্রিকেট খেলা চলছে। এই টি. ভি. বিয়ের আগে, জবা প্রথম মাইনে পেয়ে কেনে। মনে আছে। বিয়ের পর সঙ্গে এনেছে। অমিতবিক্রম এ নিয়ে আপত্তি করেনি কিছু। হয়তো, নিউজ শোনার প্রয়োজনে। একদিন ডিংকা, খেলা দেখতে, পাশের গর্কিদের বাড়ি গিয়েছিলো। রঙিন টি. ভি। কেব্‌ল কানেকশন নিয়েছে ওরা। ই. এস. পি. এন-এ দেখাচ্ছিলো। ঐ প্রথম অমিত, পিতৃতান্ত্রিক অমিত, ঐটুকু ছেলের মিহি গালে আস্ত চড় মেরেছিলো। রাতে

জ্বর আসায় জবা মৃদুস্বরে বলেছিলো, 'বুঝিয়ে বলতে পারতে, মারার দরকার ছিলো? অমিত উত্তর দেয়নি। তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পুরুষ-প্রাধান্য। জবা শুধু বুঝেছিলো পৃথিবীর ভাষা এখনও পুরুষের ভাষা। একদিন, হয়তো, ডিংকাও এভাবে তাকাবে। এভাবেই বিহেভ করবে। তাদের ভালোবাসার বিবাহের পরও জবার মনে হয় 'marriage is good for men and bad for women.' পিতৃতান্ত্রিকতা পৃথিবীর বুকে একটা উইয়ের মতো বহুদূর ঢুকে গেছে। সংসার চালানোর প্রযুক্তি জবা জানে না। বস্তুত কোনো craft-training পায়নি। মায়ের মুখ মনে পড়ে না। ৫ বছর বয়সে মা মারা যায়। তখন থেকেই তাদের সংসার ছেঁড়া কলাপাতার মতো। সংসার চালাতে গিয়ে কাকে খুশি করবে, কীভাবে—তোয়াক্কা করে না। যা মনে হয়, করে। এই যেমন সহজ কিস্তিতে ফ্রিজ কিনে নেওয়া। অবশ্য অ্যাতোটা বড়ো না কিনে ১৬৫ লিটার হলেও চলতো। কিন্তু ইচ্ছে হলো...। মাঝে মাঝে জবার মনে হয় অমিত যেন ক্রমেলক। মুখের চামড়ায় অসংখ্য লাল তিল। সমস্ত শরীর নিয়ে সে বুড়ো উটের মতো জবার শরীরের উত্তপ্ত বালুতে হাঁটু ভেঙে পড়ে। প্রাইভেট প্রপার্টি হিসেবে জবাকে চায়। তখন জবার নিজের ওপরে ঘেন্না হয়। রাতের ঐ রুটিন সেক্স-এর পর ফ্রিজ বা অন্য কমোডিটি নিয়ে অমিতের দিব্য জ্ঞান অসহ্য। ফলে অমিতের বেশির ভাগ কথা/প্রশ্নের কোনো জবাব জবা দেয় না। অমিতের প্যাট্রিয়ার্কাল স্বভাব জবার নীরবতা ছিন্ন করতে পারে না। ফলে ঐ প্যাট্রিয়ার্কিতে তখন ফাঙ্গাস। জবা জানে মেয়েদের স্বাধীনতা কম। একটা বড়োসড়ো ফ্রিজ কিনেছে, তাতেই এই। মহাভারত অশুদ্ধ! রাজনীতি করে। জীবনের অ্যালফাবেট জানে না। সে তো এক অদ্ভুত কাটাকুটি ঃ

Tic-Tac-Toe। নিচের ছবির মতো ঃ
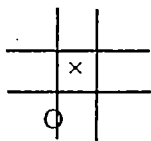
কেউ যদি শূন্যটা নির্দিষ্ট ঘরে না দিয়ে দুটি ঘরের মাঝখানে, লাইনে, রাখে তবে কী হবে। আর রাখতেই তো পারে। বড় জোর কেউ হুইস্‌ল বাজিয়ে বলতে পারে 'গোল্লাটা ঠিক জায়গায় রাখো, নইলে ফক্কা। খেলা ভেস্তে গেলো।' আসলে বুঝে নিতে হবে মানুষের জীবন ছকের বাইরেও থাকতে পারে, থাকে। অমিত কোলকাতা চলে গেলে জবা গুনগুন করেঃ

টিক-ট্যাক-টো, টিক ট্যাক টো...ও...ও...

তার মাঝে মাঝে মনে হয় অমিতটা একটা স্টুপিড।

ঘরে তেমন আসবাব না থাকলেও, অমিত যেহেতু মন্ত্রী, একটা ফোন আছে। জবা ফোনটা নিজের কাজে ব্যবহার করে না। কল রিসিভ করে মাত্র। ফোন যেদিন দিয়ে গেলো সেদিনই অমিত বলেছিলো জবাকে, পার্সোনাল ফোন করবে না। দরকার পড়লে STD বুথে যাবে। খুব জরুরি হলে লিখে রাখবে কটা কল হোলো। আমি পে করে দেবো। অথচ ঐ ফোন যার রং শাদা, লাল চোখে অষ্টপ্রহর জেগে থাকে। রিসিভার জবাকেই তুলতে হয়। সে কেন তুলবে! সে তো অমিতের অফিস নয়, তল্পিবাহক তাও নয়।

একদিন রোববার সকাল দশটা নাগাদ বাচ্চু আগরওয়াল আসে।

—ভাবিজী, কেমন আছেন?

—ভালো।

—হঠাৎ মনে হোলো চলে এলাম। আপনার বহেনজী আপনার কথা খু-উব বলছিলেন। ও বি. এ. পাশ আছে। আপনার স্কুলের ছাত্রী ছিলো। আমার তো কিছু হলো না। অমিত-ভাইয়ার দুই ক্লাস উঁচুতে ছিলাম। পিতাজীর হার্টের অসুখ। সাদি দিয়ে দিলো, দোকান দিয়ে দিলো। কেতাব বন্ধ করে নয়া পান্না খুললাম। অমিত-ভাইয়া ন্যাশনাল স্কলার হয়েছিল। আমাদের টুটাফুটা ইস্কুল থেকে। আমাদের কতো গর্ব আছে। ভাবিজী, একটা বাত বলবো, যদি কিছু মনে না নেন।

জবা চুপ করে থাকে।

—ওয়াশিং মেশিনটা বিকেলে পৌঁছে দোবো। না, না, এখন কোনো পয়সা লাগবে না। পরে দেবেন। ইচ্ছে মতো। এল. জি. আছে, হোয়ার্লপুল আছে, ভিডিওকোন...। যেটা বোলবেন। আমার মতে এল. জি. নিন। আপনার বহেনজী গত মাহিনায় নিলো। আগেরটাতে পুরনো জুতো, ছেঁড়া কামিজ, শিশিবোতল রাখে। কিছুই ফেকবে না।

—না, না, ওসব আমার চাই না। এখন তো নয়ই।

—না বললে আমি শুনবো কেন! আপনি MRC–most reliable customer।

তো আপনাকে দোবো নাকি গৌরীনাথকে দোবো! আপনি কি বলেন?

এবারে নতরদামের গির্জার ঘণ্টার মতো গম্ভীর স্বরে জবা বলে, 'না'।

—যাই ভাবিজী...দোকান খুলতে হবে। অমিত-ভাইয়া কবে আসবেন? তখন মেশিনটা নিয়ে কথা হবে। মাইরি ভাবিজী, মালটা ভালো। এক নম্বর।

অমিত কবে আসবে না জেনেই বাচ্চু আগরওয়াল চলে গেলো। জবা হাঁফ ছাড়ে। যাক্ আপদ গেছে। তবে লোকটা এম্নিতে খারাপ না। ব্যবসায়ীর

জাত। বাজার চায়। যতটুকু দখল করেছে, তারও বেশি চায়। 'ক্যাপিটালিজম্ ইজ্ টু ডে অ্যান ইমেন্স কসমস'। কে বলেছিলো ঃ মার্কস না ম্যাক্স হেবার! কিছুতেই মনে করতে পারলো না জবা। এসব ভেবে লাভ নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট। ডিংকার ব্রেকফাস্ট এখনও দেওয়া হয়নি। আসলে, রোববার মানেই ঢিলেমি। তার ওপর এই বাচ্চু ভাইরাস।

জবার প্রায় ৪ বছরের ছোটো রঙ্কু। ডিংকাকে মেলা থেকে একটা ঢোল কিনে দিয়েছে। ডিংকা অষ্টপ্রহর ওটা বাজায়। জবার কানে তালা লাগলে রঙ্কু হাসে। ভাগ্নেকে বলে, 'আরো জোরে বাজা, নিজের ঢোল নিজে না বাজালে আজকাল কিছু হয় না বুঝলি!' ছোটো ভাইয়ের জন্য জবার মন খারাপ। বেকার। বি. এস. সি.তে ডিস্টিংশন পেয়েছিলো। প্রজাপালক মন্ত্রীর শ্যালক। তবু কিছু হয়নি। শুনলে বাইরের লোক বিশ্বাস করে না। পাগল না কি! হতেই পারে না। মন্ত্রীর ভায়ের যদি বা না হয়, শালার হবে না! শালা তো সুতোর ডগা। ছুঁচে সে-ই তো প্রথম ঢুকবে। এ কেমন মেরি গো রাউণ্ড! হলদিয়াতে কত লোক নেওয়া হচ্ছে। অনেকটাই তো ওঁর হাতে। হবে না কেন? আসলে রঙ্কুর বিপত্তি সে টু-ইয়ার ডিগ্রি কোর্স পাশ। অথচ গ্রাজুয়েশনে তিনবছরের কোর্স চাই। বাইরের রাজ্যে তো বটেই পশ্চিমবঙ্গেও সরকার গ্রাজুয়েট হিসেবে এদের মানে না। অথচ, একসময়ে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ছেলেরা বাইরে যাবে কেন। এ রাজ্যেই সব পাবে। আই. এ. এস-ফেস দরকার নেই...। অন্ধ হলে যে প্রলয় বন্ধ থাকে না—জীবন দিয়ে টের পেয়েছে রঙ্কু। জবা পরামর্শ দিয়েছিলো, ব্রিজকোর্স কর্। হাসি পায় রঙ্কুর। মুঠি গলে বয়স পেরিয়ে গেলো, বলে কিনা ব্রিজকোর্স! শালা, হাওড়া ব্রিজ না বিদ্যাসাগর সেতু! ভাগ্য যেখানে ঝোলার ঝুলছে। মন্ত্রী বলে অমিতকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না সে। সামনেই বিড়ি ধরায়। তার এখনও মনে হয় একটা চুম্বক তাদের সংসারের সবচেয়ে উজ্জ্বল পিন্‌কে তুলে নিয়ে গেছে। সংসারের সব পৃষ্ঠাগুলি এলোমেলো, হাওয়ায়, ছড়িয়ে গেছে। বাবার মৃত্যুর পর দিদিই তবু কটা মাস সংসারের হাল ধরেছিলো। মাত্র কটা মাস। এখন তো বাবার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের কটা টাকা ও রঙ্কুর ট্যুইশন সম্বল। ওতেই চালাতে হয়।

বাচ্চু আগরওয়ালের শ্যেন দৃষ্টি। অমিতের অফিস থেকে টেণ্ডারের বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। তাদের তো শুধু ইলেকট্রনিক গুডসের দোকান না। এসব হাল আমলের। বংশানুক্রমে লোহার কারবারী তারা।

<u>স্টোর্স দ্রব্যাদির সরবরাহ</u>

নিম্নোক্ত দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য সিল করা টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেণ্ডার নং ২০০১/২৯/০০/৭৯৭৮। দাখিলের শেষ তারিখ ডিসেম্বর ৩১।

মালের বিবরণ ও পরিমাণ

১. ড্রয়িং নং ৩-৩৫৯-৪৪-৪ অনুযায়ী টি. ভি. টাইপ পিস্টন (বড়ো) ১০,০০০টি

২. অ্যাক্সল বক্স-প্যাকিংয়ের আঁশযুক্ত সাদা কটন ওয়েস্ট (আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯% ও ৫০ কে. জি. গানিব্যাগে প্যাকিং) ৫০০ কে. জি.

৩. গভীর নলকূপের জন্য ৩" ব্যাসের (আই. এস. আই) পাইপ ৫,০০০ মিটার

৪. ড্রয়িং নং ৭ অনুযায়ী ল্যাভেটরি প্যান ১৫০০, এণ্ড পিস ৪০০০ ইত্যাদি। ডিপোজিট মানি ঃ ৫০০০ টাকা

বাচ্চু জানে গোটা ব্যাপারটা অমিতভাইয়ার মুঠোয়। তাঁর দপ্তরের। ফলে সে সময় নষ্ট করে না আদৌ। দোকানের সদ্য কেনা মাতাদোরে L. G. Washing machine চাপায়। সোনালি রিবণে অতি যত্নে সাজিয়ে তোলে ওয়াশিং রমণী। তার স্তনে হাত রাখে। সঙ্গে বড়ো প্যাকেটে কাজু সন্দেশ। ঐ সন্দেশ চট করে নষ্ট হবার না। যদি অমিত কলকাতা থেকে ফেরে, ভাগ পাবে। মাতাদোরের পাইলটের পাশে সে, হিটম্যান। মাতাদোরে দুজন কর্মচারি ওয়াশিং মেশিনকে যে কোন ইন্‌জুরি থেকে বাঁচানোর জন্য থাকে। আজকাল আবার ড্রাইভারদের ড্রাইভার বলা যায় না। পাইলট বলতে হয়। বাচ্চু এসব জানে। ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না মুখে স্থির বসে থাকে। মনে মনে আওড়ায় ঃ

> পিটুর পিটুর মেঘ পড়ে, কৈ যাও রে ভাই
> রাজার পুতে কৈয়া দিছে, বাঘ মারিতে যাই।।

বাচ্চু আগরওয়ালের চার পুরুষ, একদা, ঢাকায় ছিলো। মাতাদোর জবাদের বাড়ির সাম্নে থামে। গোঁ গোঁ করে। জবা বিরক্ত। বড়ো রাস্তার কোলে বাড়ি। ন্যাশনাল পারমিটের ভরপেট ট্রাক ছুটে গেলে গোটা বাড়ি কাঁপে। ইঞ্জিন থেমে গেলে তাই চারপাশ জুড়ে বড়ো বেশি শান্তি...। কিন্তু তারও জো নেই। বাচ্চু আগরওয়ালের থ্যাবড়া আঙুল এখন দরজার কলিং বেলে। দরজা খুলে যায়। আজ জবার ছুটি। মহরমের। 'কাকে চাই' ধ্বনিত হওয়ার আগে সে বাচ্চু আগরওয়ালের মুখ দ্যাখে।

—কী ব্যাপার ভাইয়া!

ততক্ষণে বাচ্চুর ইশারায়, মাতাদোর থেকে, অতি সাবধানে, ওয়াশিং মেশিন নামানো হয়ে গেছে।

—না, এসব তো আমি রাখবো না।

—ভাবিজী, গোসা করবেন না। স্রেফ ট্রায়াল। মালটা এনেচি। কীরকম ফাংশন কোরচে জানা দরকার। আপনি ব্যবহার করুন। হপ্তাখানেক তো দেখুন। ভালো না হলে আমার আদমি এসে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এখন কোনো পেমেণ্ট লাগবে না। শুধু বোলবেন ক্যামোন সার্ভিস দিচ্চে। মাইরি বলছি আপনি ইউজ করলে দোকানের 'ভালো ইচ্ছে' বাড়বে। না, না, কোনো কথা শুনছি না। অমিত-ভাইয়ার সঙ্গে ফোনে বাতচিত কয়ে নোবো। আমার কাছে নাম্বার আছে। বোলুন ভাবিজী, আজকাল কাজের লোকের কতো সমস্যা! নিজের কাজ নিজে করতে হবে। 'আপনা হাত জগন্নাথ'। আচ্ছা ভাবিজী, আমি ভাবি জগন্নাথ তো ঠুঁটো। হাতপা নেই। তবে এসব কথা বলে কেন!

জবা কোনো উত্তর দেয় না। দ্যাখে, ওয়াশিং মেশিন পিছ্লে ঘরে ঢুকে গেলো। কেব্ল টানা হল স্মার্টলি, জাম্বো প্লাগ, ফিউজ সব হয়ে গেল। সার্ফ-এক্সেলের মিনি-প্যাক, ডিংকার নোংরা জামা-প্যাণ্ট—সব দিয়ে ডেমনেস্ট্রেশন পর্যন্ত। গোটা ম্যাজিক শেষ হতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগলো না। বাচ্চু আগরওয়ালের বিশাল বপু ঘামে জবজবে নুনের পুতুল। গলে যাচ্ছে। মুখে 'আমূল' হাসি। 'স্টেবিলাইজার গিফ্ট' আছে ভাবিজী ঃ 'সেন-পণ্ডিতের'। দিশি কিন্তু বড়িয়া। এখন স্টকে নেই। পরে পাঠিয়ে দেবো। বাচ্চু দরদর করে ঘামছে। জবা মূক ও বধির। ভেতরে ভেতরে বোঝে ব্যাপারটা ঠিক হলো না। সর্বদা একটা বমি বমি ভাব...

—ভাবিজী, একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন? বলুন তো আপনার রুমের হাইট কতো? অ্যাতো উঁচু সিলিং আজকাল দেখা যায় না। বাপ্রে। ১৩/১৪ হবে। বড়ো বড়ো শহরে দেখবেন ১০/১০.৫। বেশি হলে ঐ ১১। কার্নিশে কতো ঝুল জমেছে, দেখেছেন? আপনার হাইট কত? তো ধরুন ৫'২"/৫'৩"। এর বেশি না। ঝুল তো হবেই। দোকান থেকে রবিকে পাঠিয়ে দোবো। ইউরেকা ফোবস দিয়ে সব সাফ্সুতরো করে দিয়ে যাবে। দেখবেন চমৎকার জিনিষ। না, না, নিতে হবে না।

আতঙ্কিত জবাকে ফ্রিজ করে দিয়ে বাচ্চু ও তার নন্দী-ভৃঙ্গী বেরিয়ে যায়। 'আসি ভাবিজী' কথাটা অন্য চ্যানেলে ভেসে যায়। জবা শোনে না। সে তখন যেন নামতা পড়ছে ঃ এক এক্কে ঃ ফ্রিজ, দুই এক্কে ঃ ওয়াশিং মেশিন, তিন এক্কে কী? ওয়াইপার! অমিত কতটা ক্ষেপে যাবে! ভাবতে ভাবতে ১টা নীল বরফের টুকরো হয়ে যায় জবা। গলতে থাকে। আচ্ছা, অমিত এতটা পাল্টে গেলো কেন! অমিত কী তবে পাওয়ার, অথরিটি, ইনফ্লুয়েন্স, কোয়ার্শন, প্যাট্রিয়ার্কি! এই তো বছর তিনেক আগে, যখন সে মন্ত্রী হয়নি, হওয়ার কথাবার্তা চলছে মাত্র, তার কানে কানে সুধীন দত্ত

আওড়েছিলো ঃ একটি কথার দ্বিধা থরো থরো চূড়ে, ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী...। তখন জবা রাজেশ্বরী দত্ত ঃ 'কে রবে পরবাসে...'। হয়তো, রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে এমনটা হয়। মানুষ, যে গতকাল তোমার মুখপানে চেয়ে ছিলো, আজ তোমাকে চেনে না। রাষ্ট্রের নখর বাঘের, বুদ্ধি শৃগালের। সেই সব শেয়ালেরা পুলিশ, মিলিটারি, আইন-কানুন, জ্ঞাতিবন্ধন-ছিন্ন পেশাদারী আমলা। অমিত তবে ক্ষমতার কথা ভাবতে ভাবতে জবার কথা ভুলে যায়, না কি ভুলে যেতে চায়! জবা তো অন্য পুরুষে যায়নি। সে তো অমিতের ক্ষমতা পিঁপড়ের মতো খেয়ে নিতে চায় না। সে শুধু তার হকের টাকা, আর্নড ইনকাম, খরচ করেছে, করবে। অমিত বলার কে? মার্কসবাদ কি প্যাট্রিয়ার্কি? না কি অমিত শুদ্ধবাদী। ডিংকার জন্মের পর থেকেই সদর্পে ঘোষণা করেছে ছেলেকে বাংলা মাধ্যমে পড়াবে। জবা প্রথমে কিছু বলেনি। পরে বাধা দিয়েছিলো। তা নিয়ে তুলকালাম, অশান্তি। ছেলে এখনও চারে পড়েনি। এইসব গোলমালে এখনও স্কুলে দেওয়া হয়নি। ঘরে বসে কমিকস, সহজপাঠ উল্টায়, ছবি আঁকে। জবা ইংরেজিও পড়ায়। কাছে থাকে না ও সময় নেই বলে অমিত নিতান্ত বাধ্য হয়ে ডিংকার সব ব্যাপারটাই ছেড়ে দিয়েছে জবার হাতে। বলা ভালো বাধ্য হয়েছে। মানুষ তো অবস্থার দাস। স্কুলের পর জবার ক্লান্তি এতো বেড়ে যায় যে কিছু ভালো লাগে না। ডিংকাও বিরক্ত করে। তখন মনে হয় সে শুধু দাস। তার মুক্তি নেই, ব্যক্তিত্ব নেই স্বাধীনতা নেই। এ এক ধরনের সামাজিক হিংসা। গান্ধী পর্যন্ত এই হিংসার বিরুদ্ধে ১টি বাক্য উচ্চারণ করেননি। আঃ, Violence exists whenever one group controls in its own interests the life chances, environments, actions, and perceptions of another group, as men do women. এই যন্ত্রণার অনেকটাই হয়তো ধুয়ে যেতো যদি অমিত সেই আগের মতো বিহেভ করতো। ফলে জবা পেন্সিল দিয়ে ডেমাণ্ড কার্ভ আঁকে। বোঝে, সময়-বয়স-যৌবন-সিচুয়েশন-ক্ষমতা-কর্তৃত্ব-প্রভাব যন্ত্রণা বাড়ায়...।

কথার খেলাপ করেনি বাচ্চু আগরওয়াল। ওর লোক এসে দুদিন পরে স্টেবিলাইজার দিয়ে গেছে। ফ্রি। জবা ভাবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ জাতীয় স্টেবিলাইজার আছে কী। নইলে তো পুরুষ-প্রাধান্য। স্টেবিলাইজার ফ্রি পাওয়াতে সে খুশি। আজকাল হামেশাই ১টা জিনিয কিনলে আরেকটা ফ্রি। বাচ্চুকে সে কথা জিজ্ঞেস করায় বাচ্চু হে-হে করে হেসেছিলো

—ভাবিজী, এ. এক মজার ব্যাপার। বাঘবন্দী খেল্

—কী করে?

—ধরুন, আপনাকে একই দামে দু'দুটো ডুওডোরাণ্ট দেওয়া হল। লাভ খুব কম রইলো। তো ১টাতে যদি আপনার বিশ দিন যায় তবে দুটোতে চলবে ৪০ দিন...

—নাও চলতে পারে। একটার দামে দুটো পেলে কিছু তো মিসইউজ হবে।

—তবে তো আরো ভালো। ধরুন ৩৫ দিন চলবে। ৩৫ দিন ঐ বায়ারকে অন্য কেউ পাবে না। এক ধরনের কণ্ডিশনাল মোনোপলি। মার্জিনাল প্রোফিটে একটার বদলে দুটো দিলে মালটা খাবেও বেশি। পরে দাম একটু একটু করে বাড়ালে খদ্দের কিছু মাইণ্ড করবে না। ঐ মালে ততক্ষণে হেবিট এসে যাবে...হা-হা-হা

জবা ইকনমিক্স কিছু পড়লেও ব্যবসার এতো কেতা জানে না। ভাবে, বাচ্চু আগরওয়াল এক ক্লাসে দুবার ধেড়িয়েছিলো। সে এসব কী করে বোঝে! মারোয়াড়ি তো। জিনে ব্যবসা।

জবা বোঝে ওয়াশিং-মেশিনে তার লাভ হয়েছে। সময় ও শ্রম দুই-ই বেঁচে যাচ্ছে। ছেলে সামলে, রান্নাবান্না করে, স্কুলে পড়িয়ে সে মোটেও সময় পাচ্ছিলো না। বিয়ের প্রথম প্রথম হারমোনিয়মে হাত দিতো, এখন ওসব ভুলে গেছে। সময় একটু বাঁচায়, সে একদিন হারমোনিয়মের ধুলো ঝাড়লো। হারমোনিয়মের হৃদয় খুলে ঠিকঠাক টিউনিং করলো। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বুঝলো, সময় বড়ো কথা না। হারমোনিয়ম একা একা বেজে যাবে, এ হয় না।

অমিত পরের সপ্তাহে শনিবার রাতে ডাইনিং স্পেসে ঢুকে চমকায়। L. G. চোখ মারছে। বোঝে জবা তার ওপর, নিছক রাগে, ফের হটকারিতায়। জবার হাতে কতো টাকা যে ক্যাশ ডাউন করে ওয়াশিং-মেশিন কিনবে! নিশ্চয়ই ফের হায়ার পার্চেস। জবার কথাতেও টের পায়—

—সহজ কিস্তিতে দিলে হবে। প্রথম দুমাস কিছু লাগবে না। ট্রায়াল

—অ।

অমিত আর কিছু বলে না। ভয় হয়, বাধা দিলে, জেদে, আরেকটা মাল হাত-পা নিয়ে ঘরে সেঁদোবে। চুপ থাকাই ভালো। ফলে, অনহস্তক্ষেপে, সে রাতে, বহুদিন বাদে, খুব আনন্দ হয়। ইহাই জৈব নিয়ম। ইহার নিমিত্ত গুহাগাত্রে মানুষের ম্যুরাল। দরবারি কানাড়া, পাহাড়ি ঝিঞ্জিট। ইহার নিমিত্ত মনুষ্যকুলের কোনো জটিল পঞ্জিকা আবিষ্কার করিতে হয় নাই। লম্ফ জ্বালাইতে হয় না। মানুষ প্রথমে কালো, বাদামি, লাল, হলুদ ও শাদা রং ব্যবহার শিখিয়াছিলো। বর্ণমালা আবিষ্কার করিয়াছিলো, মৃত্তিকা-ফলকে বংশানুক্রমিক তথ্য ও প্রার্থনার মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলো। সকলই নিজের বিক্রমে। আনন্দে।

অমিত জানে ভোগবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ না। জীবন বড়ো লবেজান। ঢোলা আস্তিনের ভেতরে সবকিছু লুকিয়ে ফেলতে চায়—বিশেযত

যা দুষ্প্রাপ্য ও সাধারণের নয়। তার অসুবিধে যে সে এখানে বিশেষ থাকে না। যদিও এটাই তার নির্বাচনী এলাকা। সে তো মন্ত্রী মশাই। তাকে কোলকাতায় থাকতে হয়। কাজে, অকাজে! দল যেখানে যাবার নির্দেশ দেয়, যায়। নোম্যাড। সহসা মনে পড়ে ঃ The nomad is the inventor of slavery and thereby has created the seedling of the state. জবা তার মেড। সে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাইক্রোসকোপিক অণু। সেই সুবাদে জবা তার স্লেভ। নাকি সে জবাকে সত্যি ভালোবাসে। বস্তুত ওয়াশিং মেশিন নিয়ে ক্ষোভ দেখায় না। তবু তার এসকেমিক হার্টে ওয়াশিং মেশিন গোঁ গোঁ করে।

বলা ভালো, কোন এক রবিবারে, অমিতের অনুপস্থিতিতে, বাচ্চুর কর্মচারি রবি ইউরেকা ফোবস বয়ে আনে। বহুক্ষণ ধরে গোটা ঘরবাড়ি ঝকঝকে তকতকে করে তোলে। অবশ্য সবকিছু এতে তছনছ হয়। ফেরার সময় যথারীতি ইউরেকা ফোবস ফেলে যায়। বলে, পরে এসে নিয়ে যাবো বৌদি। এখন আর দোকানে ফিরছি না। বাড়ি যাবো।

চার সপ্তাহ হয়ে গেল অমিত বাড়ি আসেনি। বাচ্চু আগরওয়াল বা রবি ইউরেকা ফোবস ফেরত নিয়ে যায়নি। জিনিষটা ভালো। ও দিয়ে রং করা, গাড়ি ধোওয়া পর্যন্ত যায়। ফ্রিজের কিস্তি দিতে গিয়ে জবা বাচ্চু আগরওয়ালকে ধরে। ইউরেকা ফোবস যেন তুলে আনে। আসলে, বলা ভালো, বাচ্চুই ধরলো জবাকে ঃ

—ভাবিজী, একটা কাজ করে দিতে হবে। টেণ্ডার মেরেছি। গতকাল। একটু অমিত-ভাইয়াকে বলে দিবেন। শালা, এত কম্পিটিশন। ফেবর না করলে হবে! তাছাড়া অ্যাদ্দিন ধরে আপনারা আমাকে দেখছেন। গোটা ফেমিলিকে জানেন। দুনম্বরী তো নই। বুকে হাত দিয়ে বলেন।

এসবে জবার প্রথমে মনে হয় বাচ্চু আগরওয়াল অক্টোপাস। পরে দ্যাখে বাচ্চুর কাতর বালকসুলভ মুখ। সেখানে কোনো ইনফ্যান্টাইল ডিসঅর্ডার নেই। পবিত্র। ঠিক করে অমিতকে বলবে। পরে ভাবে, না, অমিতকে নয়, সেক্রেটারি তরুণকে বলবে। মন্ত্রীদের বউদের তুরুপের তাস ঐ সেক্রেটারি। বউরা বিলক্ষণ জানে। সেক্রেটারিরাও। ওরা মন্ত্রীকে দ'য়ে ফেলতে পারে, ভাসাতে পারে, ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলিয়েও রাখতে পারে। জবা অগত্যা তরুণের স্মরণাপন্ন হল। তরুণকে তার বাড়ির ফোনে পেয়েও গেলো একদিন।

—চিন্তা করবেন না বৌদি। সামান্য ব্যাপার। হয়ে যাবে। আরে ছোটোখাটো অর্ডার। অমিতদা জানতেই পারবেন না। এমনভাবে করবো যে সব ব্যাপারটা ফেয়ার মনে হবে। পরে ফোন করে জানিয়ে দোবো। জবা নিশ্চিন্ত। পরক্ষণে একটা অস্বস্তি বুকের ভেতরটা খিম্‌চে ধরে। এ কী ঠিক

হলো। বাচ্চু জিজ্ঞেস করলে শুধু বল্লো, 'দেখছি'।

ইউরেকা ফোবস যথারীতি জবাদের বাড়িতে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে ডিংকা ওটা নিয়ে টানা-হিঁচড়ে করে। জবা মাইনের টাকা থেকে ফ্রিজের তৃতীয় কিস্তি ও ওয়াশিং মেশিনের প্রথম কিস্তি প্রায় জোর করেই দেয়। এভাবে নিজের বিবেকের কাছে নিয়ত ঠিক থাকে। বাচ্চুর কাছ থেকে সে কোনো সুবিধে নেবে না। ফলে চোয়াল শক্ত করে ইউরেকা ফোবস তুলে নিয়ে আসতে বলে। নইলে বাড়ির বাইরে ঐ যান্ত্রিক আবর্জনা ফেলে দেবে—জানাতে ভোলে না। এইসব বাক্য প্রয়োগ করতে গিয়ে তার মুখ যথার্থই লাল হয়।

মন্ত্রীর বউ বলে জবার ভেতরে যে আত্মপ্রসাদ নেই, তা নয়। আছে। টের পায়, পাথর-হেডমিসট্রেস পর্যন্ত তাকে দেখে অন্যরকম। নতুবা বেশির ভাগ স্কুলের হেডমিসট্রেসরা তো ডিক্টেটর। আর তাদের দীপাদি তো দি গ্রেট ডিক্টেটর। সেই দীপাদি তাকে দেখে অযথা কলকল করে ওঠেন। বিভিন্ন কমিটির মেম্বার করেছেন। অমিতবিক্রমকে, জবার কারণে, স্কুলের সিলভার-জুবলিতে রৌপ্যবৎ শোভা পেতে হয়েছে। সেদিন ডায়াস-ম্যানেজমেণ্টের ভার জবার ওপরে ছিলো। প্রধান অতিথিকে মাল্যদানের ব্যাপারে জবার নাম করেছিলেন দীপাদি। জবা হেসে ফেলায় সিদ্ধান্ত পাল্টানো হয়।

ডিংকাকে সায়েন্স-সিটি দেখাবে বলেও দেখানো হয়ে ওঠেনি অমিতের। কাউকে সঙ্গে দিয়ে পাঠাতে পারতো। এতে আপত্তি জবার। গেলে তিনজনে একসঙ্গে যাবে। নতুবা নয়। বালিঘড়ির মতো সময় সর্‌সর্‌ করে আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে যাচ্ছে। অমিতের করার কিছু নেই। আসলে সে সময়কে আদৌ জাপ্‌টে ধরতে পারছে না। প্রায় ১ মাস পর আজ সে বাড়ি এসেছে। মাত্র তিন-চারদিনের জন্য। সেলোফোন নিয়ে বিছানার ওপরে খেলা করছে ডিংকা। জবার চিৎকার ঃ 'নষ্ট করে দিবি, নষ্ট করে দিবি। অমিত হাসছে। এখন অমিত গাড়িতে চলতে চলতে জবাকে কানেক্ট করতে পারবে। ঘুমিয়ে পড়লেও, ঘুমের ঘোরে, হাতের মুঠোয় উঠে আসবে ঐ নেকেড মাজা। অমিতকে খুব খুশি খুশি দেখায়। সরকার তাকে কিউবায় পাঠাচ্ছে। চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রোর দেশ। সমাজতন্ত্রের গুঁড়ো এখনও যেসব দেশে লেগে, কিউবা তাদের মধ্যে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাইড্রাহেড সেদেশে মাথা তুলতে পারেনি, এখনও। যদিও অর্থনৈতিক চাপে রেখেছে। এছাড়াও অমিত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলিতে যাবে। 'ওমবুডসম্যান' ব্যবস্থা দেখে আসবে।

—জবা, বলো তো স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি কোন্‌গুলি?

—আহা, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক...

—গুড্

সে রাতে জবা স্বপ্ন দ্যাখে অমিত নরওয়ের মেয়েদের মাঝখানে। তাকে ঘিরে আনন্দের ফোয়ারা। ওরা শরীরের পালক তুলে নাচছে। বিচিত্র ভাষা ও সুরে গান গাইছে। অমিতের মুখে হাসি। একটু বোকা বোকা। ঘুমের ঘোরে তার একটা বাহু অমিতের গলায়। 'উঃ' করে অমিত পাশ ফেরে।

ঘরের এক কোণে শ্লথ পাইথনের মতো ইউরেকা ফোবর্স পড়ে থাকতে দেখেও অমিত রা কাড়ে না। আনন্দ মাটি করতে চায় না। জবা লাফিয়ে লাফিয়ে অমিতের জন্য জামাকাপড়-জুতো মোজা রুমাল কেনে। ওয়াশিং মেশিন গোঁ গোঁ করে চলে। দুটো ভি. আই. পি স্যুটকেস কেনে। বিয়েতে তো ওসব কিছু জোটেনি। তাই এখন শখ মেটায়। অমিতেরও জিদ ছিলো তোমার বাবা কিছু দিতে পারবেন না। মুচকি হেসে জবা জানিয়েছিলো।

—আমাকেও না!

—স্টুপিড, আই লাভ য়্যু

—শোনো, ওখানে গিয়ে ছবিটবি তুলবে বাপু। কোন্ কোন্ মেয়ের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করলে ছবি দেখবো না তাদের! ওহো, আমাদের তো আবার ইয়াসিকাও নেই, আগ্‌ফাও নেই, কিছুই নেই।

—ক্যামেরা! ঘাবড়াচ্ছো কেন? সরকারি লোকলস্কর থাকবে না! তরুণও সঙ্গে যাবে। ওর ক্যামেরা আছে। ডরো মৎ।

বিকেলে জবা আড়াই হাজার টাকা দিয়ে ক্যামেরা কিনে আনলো। জুম লেন্সে অমিতের মুখ কাছে আনার চেষ্টা করলো। অমিত 'কেন কিনলে' বল্লো না। ক্যামেরার শাটার, অ্যাপারচার, স্পিড, অটো এসব খুঁটিনাটি বুঝে নিতে থাকলো। সঙ্গের লিটারেচার অনেকক্ষণ ধরে পড়লো। একটা সামারস্যুটের কথা তুলেছিলো জবা। অমিত চেঁচামেচি করায় কেনা গেলো না। তবু ১টা দুটো করে অনেক কিছু ভি আই পির ভি. আই. পিতে ঢুকে পড়লো। অমিত হেসে বললো 'দাদুর দস্তানা'।

বাচ্চু আগরওয়ালের টেণ্ডার যথারীতি অ্যাকসেপ্টেড। তরুণ কথা রেখেছে। অমিত জানে না। আসলে এসব ছোটোখাটো ব্যাপার যে মন্ত্রীকে জানতেই হবে, তা নয়। বাচ্চু খুশিতে ছল্‌কালো। AIWA ফ্ল্যাট স্ক্রিন সরাসরি, অমিতের উপস্থিতিতে, ঘরে ঢুকিয়ে দিলো। ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ওয়েবেলটা তুলে নিল। মুখে বল্লো এটা আমি নিলাম। সুভেনির। আচ্ছা, অমিতভাইয়া, তুমি মাঠে ঘাটে যাও, এদিকে ভাবিজীর সময় কী করে কাটে জানো কি! আমি তোমাকে এই মালটা দিলাম। উপহার। একই স্কুলে পড়েছি বলে না,

আসলে আমার গর্ব অমিতভাইয়া ফরেন যাচ্ছে। জানি তুমি না-না করবে। আরে, আমার ১টা স্মৃতি রাখো। জানো তো আমার হার্টে একটা ফুটো মতো আছে। কোন্ দিন দেখবে চলে গেছি। শালা, মই লাগিয়েও পাবে না।

এসব নাটকে অমিতের রাগ হয়। তবু মুখে কিছু বলে না। আসলে বাইরে যাবার উত্তেজনা তার মধ্যে চাড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমে। এখন সে কাউকে কিচ্ছু বলবে না। বাচ্চু অমিতদের সাদা-কালো সঙ্গে নিলো। 'অমিতভাইয়া এটা আমি নিলাম। তুমি তো আর এখানে থাকবে না। কোলকাতা তোমার ঘর। তুমি একদিন চিফমিনিস্টার হবে। বাজি ফেলতে পারি।' বাচ্চু আগরওয়াল বাচাল হলে স্বভাবতই অমিত মূক। এই প্রথম জবা বাচ্চুকে কফি দেয়। 'কফি আমার পসন্দ ভাবিজী।' গভীর অন্ধকার রাতে, চার পাশে আলোহীন একটি ট্রেনের চলার মতো আগরওয়াল একটানা বকে যায়।

জবা দমদম এয়ারপোর্টে কোনদিন পা দেয়নি। তবে মধ্যমগ্রামে মাসীর বাড়ি যেতে দেখেছে প্লেনগুলি লম্পটের মতো মাটিতে প্রায় ছায়া ফেলে দমদমে নামছে। এয়ারটার্মিন্যাল যেন বিদেশ। দীর্ঘ ইন্টেস্টাইনের মতো লবি। ভীড়। চেক ইন, চেক আউট। অদূরে ছানা-কাটা এয়ারস্ট্রিপে উড়াল পাখি, শাদা পাইলট, লাল-নীল-হলুদ বিমানসেবিকা, কনভেয়র বেল্ট, লাগেজের নির্ভার যাওয়া আসা, কাসটম্‌স...। জবার মনে হয় সে বিমানবন্দরের লবিতে। একটা নরম শোফায় তার নগ্ন শরীর ডুবে গেছে শুধু জেগে আছে করুণ শঙ্খের মতো আর্দ্র দুই স্তন। তার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মেটাল ডিটেক্টরের স্পর্শকাতরতা। ইজ দেয়ার এনিথিং কনট্রাব্যাণ্ড! অথচ সে কোনোদিন দমদম আন্তর্জাতিকে ঢোকে নি। এবারে অমিতকে সী-অফ করার কথা উঠলেও শেষ অব্দি সে গেলো না। আসলে অমিত তেমন গা-ই করলো না। ডিংকাকে এয়ারপোর্ট দেখানোর একটা ইচ্ছে যে মাঝে অদম্য হয়ে ওঠেনি তা নয়। নির্ধারিত তারিখে যথারীতি রাত সাড়ে-নটায় অমিতবিক্রমের প্লেন শূন্যে উড়লো। জবা ডিংকাকে নিয়ে তখন কার্নিশহীন ছাদে। তার জানা ছিলো ঐ সময়ে আকাশের দক্ষিণ-পূর্বে একটি বায়ুশকট নিয়মিত নিজস্ব ভ্রামকরেখায় উড্ডীন। তার লাল-সবুজ আলো চকমকি সদৃশ্য। জ্বলে, নেভে, কাঁপে। ডিংকাকে জবা ঐ প্লেন দেখানোর চেষ্টা করে। ডিংকা চেষ্টা করলেও দ্যাখে না। কারণ আকাশ কোথাও কোথাও অশ্রুভারানত। প্লেন অচিরে মেঘের ভেতরে হারিয়ে যায়। 'দুৎ বোকা' বলে ডিংকাকে আদর করে জবা। ছাদে কিছুক্ষণ থাকার পর ধীরে ধীরে নেমে আসে। নামতে নামতে তার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। আকাশে যদি ঝড় জমে, যদি ঐ বিমান...। জবার বুকের ভেতরে ডিপ্ লিব শব্দ জবা নিজেই শুনতে পারে। ডিংকাকে

আচমকা জড়িয়ে ধরে।

অমিত বলেছিলো হাভানা পৌঁছে ফোন করবে। ৪৮ ঘণ্টা কেটে যাবার পরেও ফোন না আসাতে জবা চিন্তিত। শেষে, কলকাতায় তরুণের ফ্ল্যাটে ফোন করে। তরুণের বাবা ফোন ধরে বললেন, মাত্র আধঘণ্টা আগে তরুণের ফোন পেয়েছেন। ওরা ভালোভাবেই পৌঁছেছে। চিন্তার কারণ নেই। প্রথমে স্বস্তি হলেও পরে রাগ হলো জবার। কীরকম লোক! পার্টি-প্রোটোকল অক্ষরে অক্ষরে মানে, ফ্যামিলির না। কিছুক্ষণ সে ফোনের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করলো। ডিংকা পাশের ঘরে। ঘুমোচ্ছে। সে একে একে পোশাক খুলে ফেললো। দর্পণে এখন তার নগ্ন শরীরের কোণারক। ডিংকা হওয়ার সময় তলপেটে পড়ে থাকা কিছু আঁকিবুকি ছাড়া শরীরের অন্যত্র কোনো ফাটল নেই। কীরকম লোক! এই শরীরকেও মনে রাখে না! সে বোঝে ক্ষমতার শরীর সব কিছু ঢেকে দেয়। ক্ষমতার বুকে মুখ চেপে ধরলে একবারও তবে দম বন্ধ হয়ে আসে না! অথচ তার দুই ভারী স্তনে মুখ রেখে নিঃশ্বাসের জন্য ছটফট করে অমিত। বারবার বুক থেকে মুখ তুলে নেয়। অপ্রতিভ হাসে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুলের জট ছাড়ায় জবা। গোড়ালি নয়, প্রায় হাঁটু অব্দি তার চুলের ঢল। স্কুলে যাবার সময় এই চুল তাকে ভারি বিপদে ফেলে। অগত্যা চুল না শুকিয়ে ভেজা চুল পিঠে ফেলে তাকে স্কুলে যেতে হয়। পিঠের ব্লাউজ ভিজে থাকে। তারপর একসময়ে শুকিয়ে যায়। আসলে ভেজা চুলে খোপা করতে অসুবিধে। অন্তত জবা পারে না। আর পারলেও ওতে চট্ করে মাথা ধরে। এক একবার ভাবে চুল কেটে ফেলবে। অমিতই বাধা দেয়। বিয়ের আগে এই চুল নিয়ে বনলতা সেন হতো। এখন অবশ্য ওসব হয়না। অথচ প্রথম প্রথম চুল খোলা রেখে অমিতের সাম্নে সকালের বেড-টি রাখার সময় অমিত ডাকতো 'অপাবৃতা'। রান্না করার সময় চুল উঁচু করে বাঁধলে ডাকতো 'হরসুন্দরী'। ছুটির বিকেলে, দুই বেণী করলে বলতো 'যোধাবাঈ'। তখন সবই ভালো লাগতো। মন্ত্রী হবার পর অমিতের মুখে এইসব ডাক জবা আর কখনও শোনেনি। হয়তো সময় নেই। হয়তোবা মন নেই। অঙ্কের টিচার মিনু বলে, তুই একটা ড্রায়ার কিনে ফেল। ৫ মিনিটে চুল রেডি হবে। ভেজা চুলে থাকলে নির্ঘাৎ উকুন হবে। একদিন, স্কুল ফেরত, মিনুকে সঙ্গে নিয়ে হেয়ার ড্রায়ার কিনলো জবা। ফিলিপ্স ঃ ১০০০ ওয়াট। মাত্র ৬৯৫ টাকা। ইস্, অ্যাদ্দিন কেন কেনেনি! তাহলে রোজ রোজ চুলের সঙ্গে চুলোচুলি করতে হতো না। আঙুলে গাদাগাদা চুল জড়িয়ে যেতো না। এখন স্নানের পর ৫/৬ মিনিটে চুল রেডি, ঝরঝরে। বাঁধো, খোলা রাখো, বেণী

করো—যা খুশি। অমিতের অনুপস্থিতিতে হেয়ার ড্রায়ার কিনতে জবার হাত কাঁপলো না। বরং ভাবলো অমিতেরই উচিত ছিলো অনেক আগে ওটা কিনে দেওয়া। দেয়নি কেন? প্যাট্রিয়ার্কিতে এসব প্রশ্নের জবাব নেই, কেউ দেয় না। লাভ-ম্যারেজে তো সমতা-পরিবার হওয়ার কথা। কিন্তু এদেশে সমতা পার্টি হয়, সমতা পরিবার—equalitarian family হয় না। সব পুরুষতান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক। অমিতবিক্রমের বিক্রম সে দেখে নিতে চায়। শেষে একদিন, অমিত ফেরার আগে, বিউটি পার্লারে চুল কেটে ফেলে। একদম ছোটো। বয়কাট্। আসলে বয়কাটের মধ্যে 'বয়' থাকায় সে খুশি, ম্যাসকুলাইন। স্কুলে এ নিয়ে নানা কথা হলেও জবা ভ্রূক্ষেপ করে না।

ডিংকা কেক খেতে ভালোবাসে। জবা ছুটির পর মাঝে মাঝে ওর জন্য মঙ্গিনিস বা জলযোগের নরম কেক আনে। এক আধদিন আইসক্রিমও। চকোবার ছাড়াও, মায়নার দিনে, কর্নেটো। বিয়ের প্রথম প্রথম নিজের সংসারে কেক ওভেন ছাড়াই, সেফ্‌টি ভাল্‌ভ খুলে রেখে প্রেসার কুকারে চমৎকার কেক বানাতো। মাঝে মাঝেই বানাতো। তার স্বাদ নাকি এখনও অমিতের জিভে। এখন্ আর পারে না। ধৈর্য নেই। স্কুল শেষে ক্লান্ত জবার বাড়ি ফিরে ঘুম পায়। আর কিছু ভালো লাগে না। কার জন্য করবে! অমিত তো কলকাতায়। ডিংকার অস্তিত্ব, মুহূর্তের জন্য, ভুলে যায় সে। ডিংকা আজকাল ভারী বিরক্ত করে। কাজের মেয়েটির সঙ্গে তার একা একা থাকা, অমিতকে কাছে না পাওয়া, জবার স্কুলে চলে যাওয়া তাকে কীরকম একরোখা করে। তার নিজের মেজাজও যেন কীরকম দিদিমণি, দিদিমণি হয়ে যাচ্ছে, রুক্ষ। ছেলেকে তেমন আদর করা হচ্ছে না আর। তাই সে মাইক্রোওয়েভ কেনে। যখন ইচ্ছে ডিংকার জন্য কেক বানাতে পারবে। যা কিনেছে তা মাল্টিন্যাশনাল ফিলিপস না, দিশি বাজাজ। কাগজের বাক্সে একটা চোখ আঁকা। অমিত ঐ চোখে আপত্তি করতে পারবে না। পরপর শনি-রবি, মাইক্রোওয়েভ কেনার সুবাদে, মহোৎসাহে কেক বানায়। ডিংকা খুশি। বাপের বাড়ির জন্য, রঙ্কুর জন্য, একদিন বড়ো একটা কেকও দিয়ে আসে। মিনুর ছেলেকে একটা ছোটো সাইজের। কিন্তু যা হয় আর কী, কয়েক দিন পরে আর উৎসাহ থাকে না। ইউরেকা ফোবসের মতো মাইক্রোওয়েভও খাটের তলে পড়ে থাকে। বাজাজ ওভেন কেনার সময়ে জবা হাল্কা আয়রন ও ল্যান্টার্ণ দ্যাখে। একদিন গিয়ে, একাই কিনে আনে। দুটো মিলে দাম তেমন বেশি না। ব্যাপক লোডশেডিং-এ বাজাজ-ল্যান্টার্ণ খুব কাজে আসে। দেশলাই কাঠি ঠুকে ঠুকে মোম জ্বালাতে হয় না। আসলে জবা দেখেছে ১টা মোম জ্বালাতে তার ৩টে বা ৪টে দেশলাই কাঠি জ্বালাতে হয়। তখন, ঐ অন্ধকারে,

মেঝে নোংরা। ইস্ত্রি হাল্কা হওয়ায় জবার ওটা ব্যবহার করতে যথার্থই সুবিধে। মিনু শুনে বলে, তুই বোকার মতো ওভেন কিনলি কেন, মিক্সার কিনলে পারতিস। ওটা বেশি কাজের। আজকাল গুঁড়োমশলার বেশির ভাগ তো ঘোড়ার ইয়ে। বরং নিজে গুঁড়ো করে নিবি। জবা ভাবে, সুযোগ পেলে মিক্সার কিনবে। জবা বরাবর পারফিউম-বিলাসী। সুগন্ধী সাবানেরও খোঁজ রাখে কম না। যেমন Doy Care। Doy care is a high quality cream soap in the shape of woman's face covered by flower petals. It comes with a woody perfume and ensures longevity of the aroma. জবার ড্রেসিং টেবিলে সারি সারি রূপজ সৈন্য—eau-de-toilette, বডি স্প্রে, ডিও স্টিক্‌স, রোল-অন্‌স্‌, ছত্রিশ কিসিমের ঠোঁটের রং, নখের রং, লিকুয়িড মেকআপ, আলবার্তো Vo5 শ্যাম্পু—পাঁচ রকমের ভিটামিন তাতে, আরও কত কী! ইকনমিক্স-এর টিচার বলে শরীর শুকনো বাদাম হবে তাতো নয়। মুখাবয়বে যাতে কঠিন রেখা না পড়ে সে জন্য সে বরাবর মিষ্টি ব্যবহার করে স্টুডেন্টদের সাথে। বকে না পর্যন্ত। প্রোটেকশন, হেল্‌থ কেয়ার, যোগাসন সবই করে সে। জবার মনে হয় এসব কার জন্য—অমিতের জন্য না নিজের জন্য! যেটাই হোক না কেন সবটাই একধরনের deployment of sexuality। নিজের ওপর তখন রাগ হয়। অমিতের ওপর আক্রোশ।

২৭ দিনের মাথায় অমিতবিক্রম বাড়ি ফিরলো। সত্তরের দশকে দিনের পর দিন বাড়ি ফেরেনি অমিত। জবা জানে। তখন ওরা পাশাপাশি থাকতো। দুজনেরই ক্লাস নাইন। প্রেমট্রেম হয়নি তখন। আজ ফিরতে জবার মনে হলো অমিত যেন বহু বছর বাদে ফিরলো। খুব ফর্সা লাগছে অমিতকে। গালে ১ দিনের নীল দাড়ি। লম্বা দোহারা অমিতবিক্রম শাদা অ্যাম্বাসাডার থেকে নামে। ঐ গাড়ি, বড়ো অনুগত। স্টেশনে যেমন থাকার, যে সময়ে থাকার, ছিলো। ড্রাইভারের পাশে শিবেনও ছিলো। শিবেনের পকেটে রিভালভার থাকে, জবা জানে। দুটো জাম্বো স্যুটকেশ, একটা বড়ো রোলার ব্যাগ গাড়ি থেকে নামিয়ে ড্রাইভার মেঝেতে রাখে। ১০০ টাকা শিবেনের হাতে দিয়ে অমিত বলে ড্রাইভারকে চা খাইয়ে দিস। কাল আসবি। তোর জন্য কিছু জিনিষ এনেছি। শিবেন চলে গেলে জবা দরজা বন্ধ করে ঘুরতেই অমিত তাকে জড়িয়ে ধরে। 'আঃ, ছাড়ো আগে স্নানটান করে নাও তো।' অমিত চেঞ্জ করে নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাতে চায়ের কাপ ও বিস্কিট ধরিয়ে দেয় জবা। অমিত চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে, 'মন্দোদরী, কাছে এসো, দশমুখে তোমায় চুমু খাবো। শালা, রাবণের অ্যাডভান্টেজটা দ্যাখো, দশমুখে একসঙ্গে

দশবার চুমু খেতে পারে। আর রাম? কোনো মানে হয়!' ডিংকা ঘুমুচ্ছে। টের পায়নি বাবা এসেছে। খাওয়া দাওয়ার পর সত্যি সত্যি দশমুখে জবাকে খেয়ে ফেললো অমিত। সে অমিতের শরীরে বিলিতি আতরের গন্ধ পেলো সহসা।

ঘরে মৃদু নীল আলো। অমিতের নগ্ন শরীর মালে ঠাসা দুটি ঢাউস সুটকেশ বিছানার ওপর টেনে-হিঁচড়ে তুললো। সহস্র চাবির রিং থেকে ঠিকঠাক চাবি সুটকেসের নাভিতে। খুট্ করে শব্দ হলো। খোলা সুটকেসে ঝুঁকে পড়লো জবার নগ্ন শরীর। আঙুলের আঠায় রমণী-আতর, ব্রা, ঠোঁটের রং, শ্যাম্পু, ড্রায়ার, শেভার, রিস্টওয়াচ। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার আগে দুটি সুটকেসই উপুড় করে অমিত। ওগুলোর ওপর হামলে পড়ে জবার শরীর, আতুর স্তন। তারপর দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। গোল হয়ে ঘোরে দুটি নগ্ন ছায়া। নাকি, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, ইউরেকা ফোবস ল্যাণ্টার্ণ, অমিতের আনা কসমেটিক্স তাদের দুজনকে ঘিরে ফেলে। গোল হয়ে ঘোরে। লক্ষ্মণের গণ্ডি ক্রমে ছোটো হয়ে আসে। জবার আর কোনো বিকল্প নেই। consciousness is functional। সে চিৎ হয়। সে এখন L. G.র শাদা শরীর। বস্তুত শীতল। ফ্রিজিড। অমিত সেই ঠাণ্ডা শরীরে ঢুকে পড়ে। জবার স্তন মথিত হলেও সাড়া দেয় না। কঠিন হয় না। কিছু পরে অমিত জবাকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে বিছানা থেকে ওঠে। A number of people graw on a bone and then put it back in the dish—this is serious offence. নগ্ন হাড়ের মতো, রক্তমাংসহীন শাদা শরীর নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকে জবা। কাঁদে। অমিত টের পায় জবা, এক্ষণে, উত্তাপহীন কমোডিটি মাত্র। সে জবার কাছে আসে। জবার হাত মুচড়ে আইসকিউবের মতো ভেঙে নেয়, জবার নিটোল নগ্ন জানু ইউরেকা ফোবসের নলের মতো খুলে ফেলে, জবার দুই স্তন ফরাসি আতরের মতো ক্ষুদ্র কাচের অবয়বে রাখে। সে বস্তুত কোনো রিস্ক নেয় না। জবার শরীরের প্রতিটি অংশ, কমোডিটি জ্ঞানে, সুটকেসে পুরে ফেলে। সুটকেসের লকের শব্দ হয় ঃ খুট্।

নুরুদ্দি হাজীর গল্প নয় ইয়া বড় টিনের তাওয়ার গল্প

নীহারুল ইসলাম

নুরুদ্দি হাজী নিজের বাড়ির ছাদে 'ইয়া বড় টিনের তাওয়া' বসিয়েছে। কখন বসিয়েছে গ্রামের কেউ তা জানতে পারেনি। একদিন পোঁহাতে ঘুম থেকে উঠে ঝিমচকচকে তাওয়াটার দিকে তাদের চোখ পড়ে। আর তারা অবাক হয়। ভাবে, হাজী আবার ই কুন যন্তর বসাইলে ছাতে!

নুরুদ্দি হাজীর ব্যাপার-স্যাপারগুলি এমনই। সে যা করে তাতেই তার গ্রামের লোকেরা অবাক হয়। আর সে ভাবে, ওরা তার হিংসা করে।

নুরুদ্দি হাজী তখন বাজার বেরোচ্ছিল। হঠাৎ দেখল তার বাড়ির সামনে ডহর ঘেষা খাস জায়গাটায়, যেখানে বিকালে বালবাচ্চারা খেলকুঁদ করে—সেখানে মেলা, মানুষের ভিঁড়। এমন জটলা যে হবে তা সে অনুমানে কাল রাতে বাক্কারকে বলেছিল, রাত বুল্যা বাঁচান ভাই। না তো এতক্ষুণ দেখতা মজা। চারদিকে গিধনীতে ভরে যেত। বাক্কার কাল রাতে ওটা ফিট করতে এসেছিল।

গিধনী মানে শকুন।। নুরুদ্দি হাজী তার গ্রামবাসীদের শকুন ভাবে। কারো সঙ্গে তেমন ভাবে রা'ই কাড়ে না। রা' কাড়বে কি? সব তো তার দুষমন। তার মওত মোনাজাত করে সবাই। নিজের কানে শুনেছে সে একদিন জুম্মার নামাজে মসজিদে। তখন মোনাজাতের সময়। মসজিদে উপস্থিত সব নামাজী জোড় হাত পেতে 'আল্লাহ আমিন' উচ্চারণ করছিল ইমামকে সমর্থন জানিয়ে। নুরুদ্দি হাজী নিজেও করছিল। তবু সে স্পষ্ট শুনেছিল কে যেন পেছন থেকে তাকেই উদ্দেশ্য করে উচ্চারণ করছিল, "শালা বাঁঝা হাজী যেনে মরে আল্লা তাহলে আধসের বাতাসা বিলাবো আল্লা" শুনে 'আল্লাহ আমিন' উচ্চারণ থেমে গেছিল তার পেছনে কাতারে বসে থাকা কোন বদমায়েশ নামাজীর মুখ থেকে। সে কণ্ঠ ফিস্‌ফিস্ কণ্ঠ—না হলে সে ধরতে পারতই, এস্তাজের বেটা রাব্বুল না ইনশান এমন বদদোয়া করেছিল তার জন্য। কেননা তার একেবারেই পেছনে ওরা দু'জনেই বসেছিল।

এখন তার বাড়ির সামনেকার জটলায় রাব্বুল আর ইনশান—দু'জনকেই দেখল সে। দেখে সে আবারো ভাবল কে সেদিন তার জন্য অমন বদদোয়া করেছিল? কে, রাব্বুল না ইনশান! ইনশান না রাব্বুল? ভাবতে ভাবতে

ধুলাউড়ি বাজারে পৌঁছে গেল নুরুদ্দি হাজী। তার বাড়ি থেকে ধুলাউড়ি বাজার বেশী দূরে নয়। মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ ধুলাউড়ি বাজারে জোলাপট্টিতে তার বিশ্বাস বস্ত্রালয়।

বিশ্বাস বস্ত্রালয়ের সামনে তখন রীতিমতো ভিড়। ভিড়ের মধ্যে কালাম ও তাহেরকেও দেখল নুরুদ্দি হাজী। ওরা তার দোকানের কর্মচারী। প্রতিদিনই সে এই দৃশ্য দেখে জোলাপট্টিতে পা রাখতে রাখতেই। আর এই দৃশ্য দেখে প্রতিদিনই দিল-খোশ হয়ে ওঠে। আর একটা ব্যাপারও ঘটে; তা হল, তার ডান হাতের তালু চুলকায় এমন ভিড় দেখলে। অবশ্য তার বাড়ির সামনেও মাঝে মধ্যে এমন ভিড় জমে। কিন্তু দেখতে তার অসহ্য লাগে। অথচ দোকানের ভিড়! সে তো লক্ষী!

লক্ষী! নিজের দোকানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে নুরুদ্দি হাজী জিভ কাটে। আসতাগ্ ফেরুল্লা। ব্যবসা করতে বসে তার ভিতরেও হিন্দু কৃষ্টি ঢুকে গেল। তৌবা-তৌবা—খরিদ্দার তার লক্ষী হবে কেন? লক্ষী তো সে কখনো কখনো তার বিবিকে বলে সোহাগের সময়।

—সালামো-আলাই-কুম হাজীসাহেব। কোরাশে উচ্চারিত হয়।

—আলাইকুম-সালাম। নুরুদ্দি হাজী উত্তর দেয়। সঙ্গে কুশল সংবাদও নেয়, কি ভাইসকল সব খবর ভাল তো?

—জী হাজী সাহেব।

এই খরিদ্দাররা প্রায় সকলে বাংলাদেশী। চোরাপথে এপার থেকে বাংলাদেশে কাপড় নিয়ে যায়। বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসে ঘড়ির পার্টস, সোনার বিস্কুট। সাহাপট্টির সাহা ওয়াচ কোং-এর বিনয় সাহা তো এদের বলেই ফেলে, তোমরা হচ্ছো শাঁখের করাত। আসতেও কাটো যেতেও কাটো। তবে নুরুদ্দি হাজী এমন কথা বলে না। বলবেই বা কেন? এরা যে তাকে সম্মান দেয়।

আর, এদের চোখেও নুরুদ্দি হাজী লোকটার ইমান আসে। হাজী মানুষ যখন, নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলে না। ন্যায্য দাম ধরে। লাভ যতটুকু করবার ততটুকুই করে। ইমান আছে না লোকটার! গেল বছরই তো একমাস দোকান বন্ধ রেখে লোকটা হজ করে এল। তাতে কি কম লস্ হয়েছে? কিন্তু রোজগারপাতি নয় এবাদতই আসল কথা—নুরুদ্দি হাজীকে দেখলেই এরা তা বুঝতে পারে।

এ ব্যাপারে নুরুদ্দি হাজীর কিছু নিয়ম নীতি আছে অবশ্যই। দোকানে যত খরিদ্দারই থাকুক, নামাজের ওয়াক্তে সে নামাজ পড়বেই। সেটাও আবার দোকানেই। জোহর কিম্বা আসর কিম্বা মগরো। নামাজের ওয়াক্তে মুসলমান নামাজী খরিদ্দার দোকানে থাকলে তাদেরকে নিয়েই নামাজ পড়বে যারা

নামাজ পড়ে না, তাদের নসিয়ত করবে। ওজুর পানি এগিয়ে দিবে। নামাজীদের ওজুর জন্য তার দোকানে দশটা প্লাস্টিকের বদনা রাখা আছে। সেগুলিতে সব সময় পানি ভরতি থাকে। এসবের দায়িত্ব তার দোকানের কর্মচারী তাহেরের। নামাজের ওয়াক্তে তাহের তাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোন বদনায় পানি নেই তা দেখা। যারা যারা নামাজ পড়বে তাদের ওজুর জন্য বদনা ভরতি পানি এগিয়ে দেওয়া। ওদের হাত মুখ পোছার জন্য গামছা ধরে রাখা। এসব ব্যাপারে তাহের দিনকে দিন এক্সপার্ট হয়ে উঠছে। অল্প অল্প দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে তার। তাই সে যখন নামাজের ওয়াক্তে মাথায় টুপি পিনধে পুরুদ্দি হাজীর পেছনে দাঁড়ায় নুরুদ্দি হাজীর নিজের ছেলে বেলাকার কথা মনে পড়ে তখন।

নুরুদ্দি হাজী হয়নি তখন। তারও আগে ধুলাউড়ি বাজার যখন বাজার হয়নি, সামান্য একটা হাট ছিল, তার এই বিশ্বাস বস্ত্রালয় তো দূর অস্ত—সে যখন তার গাঁ বিলাইহাঁচড়ি থেকে পিঠে কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে পাক্কা দু'ঘন্টা ধূলার রাস্তা হেঁটে এসে এখানে চটিতে বসে গামছা লুঙ্গি বিক্রি করত, তখন তার বয়স এই তাহেরের মতোই ছিল বোধ হয়। অল্প অল্প দাড়ি গোঁফ গজানো মুখে সে তখন খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে তাকিয়ে দেখত ফাঁকা মাঠের মধ্যে রোদ বৃষ্টি মাথায় করে হাটুরেদের নামাজ পড়া। আর ভাবতো আল্লার প্রতি মানুষের পরম বিশ্বাসের কথা। সেই ভাবনা থেকেই একদিন সেও নামাজী হয়ে গেল। আর আল্লার কাছে মানত করল, আল্লা যদি তাকে মেলা সম্পত্তির মালিক করে, ধনী করে—তাহলে এই হাটে সে একটা মসজিদ তৈয়ার করে দেবে।

কিন্তু আল্লা তাকে ধনী করার আগে ধুলাউড়ি হাট আর হাট রইল না। বাজারে পরিণত হল। বিঘা বিঘা মাঠান জমি বিক্রি হতে লাগল। ওই সব জমিতে গড়ে উঠল বিল্ডিং। সবই যেন রাতারাতি। পিঁপড়ে যেমন গুড়ের খবর রাখে তেমনি ব্যবসার খবরে এই ধুলাউড়িতে এসে ভিড় করল সব সাহা-বেনা-মাড়োয়ারীর দল। তখন সবে যুদ্ধ জয় করে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে।

নুরুদ্দি হাজী কিছুই ভোলেনি। তবু তার তকদীর ভাল যে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় বহুদিন হাট করে আসছিল বলে তার সেই চটির জায়গাটা হাতছাড়া হয় নি। বহুকষ্টে সেখানেই গড়ে তুলেছিল আজকের 'বিশ্বাস বস্ত্রালয়'।

তারপর আল্লা দিয়েছে, ধুলাউড়ির পাশেই রাধাকান্তপুরে সে দো-মহলা বাড়ি করেছে। এখন আর ব্যবসা করে তাকে রাত কাটাতে নিজের গাঁ বিলাই হাঁচড়িতে যেতে হয় না। বিলাই হাঁচড়ির সঙ্গে আর তার কোন সম্পর্কই নেই বলতে গেলে। সেখানকার ভিটেমাটি বিক্রি করেই তো গতবছর হজ

করে এল। ভাই ভাতিজারা বিক্রি করতে মানা করেছিল। বলেছিল, আল্লা তো তুমাকে মেলা দিয়াছে। এগলা আর বিক্রি করিও না। এগলা হাঁরঘেরই থাক্। হামরায় ভোগ করি।

নুরুদ্দি হাজী শোনেনি। ভাই ভাতিজারা তাকে স্বার্থপর ভাবল। কিন্তু কেউ না জানুক সে জানে আর তার আল্লা জানে। কেননা আল্লার কাজে তার মানত আছে এই ধুলাউড়ি বাজারে একটা মসজিদ তৈয়ার করে দেবার। আর সেটা করতে হলে এত টাকার দরকার তা একমাত্র হজ করতে গিয়েই উপার্জন করা সম্ভব।

হজ করতে গিয়ে উপার্জনের বুদ্ধিটা সে পেয়েছিল কালুহাজীর কাছ থেকে। কালুহাজী তার দোকানের খরিদ্দার। আগে অবশ্য খরিদ্দার ছিল না। ভিখারী ছিল। লোকে বলত ল্যাংড়া ফকির। জন্ম থেকেই কালুর একটা পা লুলা ছিল বলে। এসবই নুরুদ্দি হাজীর জানা। কিন্তু ল্যাংড়া কালু একদিন হাজী হবে, গেরস্থ হবে তা জানা ছিল না। পরে অবশ্য জেনেছিল যেদিন কালু পাজামা-পাঞ্জাবী মাথায় টুপি পরে তার দোকানে কাপড় কিনতে এল। বেলডাঙ্গার এক দিলদার পরহেজগার ইনসান কালুকে নিজের খরচে হজ করতে নিয়ে গেছিল। শুধু কি তাই, হজ থেকে ফেরার পর প্রচুর টাকাও দিয়েছিল। সে টাকায় ক'বিঘা জমি কিনেছে কালু। হালবলদ করেছে। এখন বাড়িতে রাখাল-মাহিন্দার পোষে। লোকে এখন ল্যাংড়া ফকিরকে কালু হাজী বলে সম্ভ্রম করে।

নুরুদ্দি হাজী তখন বুঝে পায়নি কে এমন লোক যে এক ল্যাংড়া ফকিরকে হজ করিয়ে আনল আবার এত টাকাও দিল।

সেই দিলদার পরহেজগার ইনসানের খোঁজ পেয়েছিল নুরুদ্দি হাজী খুব কষ্ট করেই। আর তার কাছেই জেনেছিল আসল ব্যাপারটা। কালুর মতো ল্যাংড়া লুলা লোকদের নিয়ে গিয়ে মক্কায় ভিখ মাগানোতে অনেক রোজগার। এত রোজগার যে ওই সব ল্যাংড়া-লুলার হজ খরচ বাদেও ওদের দু'দশবিঘা ভুঁই কিনে দিলেও যা থাকে, তা মেলা।

নুরুদ্দি হাজী সেদিনই স্থির করেছিল ইনশাল্লাহ সেও হজে যাবে।

হজে গেছিলও সে। কিন্তু কালুর মতো কোন ল্যাংড়াকে নিয়ে যেতে সাহস পায়নি। কি জানি যদি ল্যাংড়া নিয়ে গিয়ে কোন ফ্যাংড়া হয়। তবে সে এক কাজ করেছিল, হজে যাওয়ার আগে মসজিদের চাঁদা আদায়ের রশিদ ছাপিয়ে নিয়েছিল। প্রতিভা প্রেসের মৌলভী কম্পোজিটর আরবী অক্ষরে ছাপিয়ে দিয়েছিল সেই রশিদ। আর সেই রশিদ নিয়ে গিয়ে মক্কায় চাঁদা আদায় করেছিল সে। সেই চাঁদার টাকায় প্রচুর সোনা কিনেছিল। আর সেই সোনা জমজমের পানির ডিব্বায় ভরে এনেছিল বাড়ি। কেউ তার মালুম

পায়নি। তবে সে হাজী হয়েছে, তার ব্যবসা বেড়েছে—এখবর জানতে কারো বাকী নেই। ইনশাল্লাহ এখবরও কারো জানতে বাকী থাকবে না এই ধুলাউড়ি বাজারে তার পয়সায় একটা মসজিদ গড়ে ওঠার সংবাদ। তবে তার আগে আর একবার হজে যেতে হবে। ইনশাল্লাহ সে যাবেও আসছে বছর না হলে তার পরের বছর।

ইতিমধ্যে নুরুদ্দি হাজীর হাত থেকে চাবির গোছ নিয়ে দোকান খুলে ঝাড়ু ঝাটা দিয়ে ফেলেছে তার কর্মচারী তাহের। কালাম জমজমের পানি দিয়ে ক্যাশবাক্সের উপরটা মুছছিল। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা খরিদ্দাররাও আর বাইরে দাঁড়িয়ে নেই। ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ওরা সবাই ভিনদেশী খরিদ্দার। ওদের ডি আই বি. কাস্টমস পুলিশের ভয় আছে। ধরা পড়লে পুঁজি গায়েব হস্ক। মারও খেতে হয় প্রচুর। তারপর লালবাগ জেল আছে 'বন্দি কারাগারে গাইবার' জন্য তাই ওদের সতর্ক থাকতে হয়। নুরুদ্দি হাজী নিজেও সতর্ক থাকে যতক্ষণ না সবার কাজ করে টাকা নিজের ক্যাশবাক্সে জমা হয়, ক্যাশ ফুলে ওঠে।

তাই কাগজ-কলম নিয়ে প্রথমেই বসে পড়ে নুরুদ্দি হাজী। এক এক করে নাম লিখে সবার কাছকার টাকা নিতে শুরু করে কুসুমুদ্দিন—পাঁচ হাজার/সাদেমান তিনহাজর দুশো—এভাবে সবার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হলে সে মুখ খোলে, বুলেন কার কি লাগবে?

আবার সবাই একে একে বলে যায়। আর সে তাদের নাম জমা টাকার পাশে লিখে চলে কার কত পিস আলিফ লাইলা, কার কত পিস মাধুরি, কার কত পিস পরাগ। এসব হল গিয়ে শাড়ি, কাপড়ের নাম। নুরুদ্দি হাজীর ব্যবসা এমনি ভাবেই শুরু হয় প্রতিদিন। তখন আর তার কোন কিছুই মনে থাকে না। এমনকি কথায় কথায় যে আল্লার নাম সে উচ্চারণ করে, সেই আল্লাকে কাপড় আর টাকার স্তূপে এমন ভাবে হারিয়ে ফেলে যেমন তার মুখের দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে বিবির মাথার উকুন হারিয়ে থাকে, তেমনি।

অথচ কি আশ্চর্য্য জোহর হলেই তার নামাজের কথা খেয়াল হয়। তখন সব কিছু সরিয়ে রেখে নামাজ পড়ে। তারপর কালামকে পাঠিয়ে বাড়ি থেকে আনানো হটপটে গরম ভাত আর তরকারী, তরকারী মানে গরুর গোস্ত, প্রতিদিন-ই যা বাজারের দাসু কসাই একসের করে দেয় তার বাড়িতে—খুব আয়েশ করে খায় নুরুদ্দি হাজী। খায় দোকানের কাপড়ের আলমারীর পেছনে বসে। তখন তার বিবির রান্না করা গোস্তের মহক 'বিশ্বাস বস্ত্রালয়ের' প্রাচীর ফুটে সারা জোলাপট্টিতে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই জানতে পারে হাজী খেছে এবার।

নুরুদ্দি হাজী যা করে, খোদার কি মহিমা লোকে তা জেনে যায়। এতে

তার যেমন আনন্দ হয় তেমনি দুঃখ। দুঃখ হয় তার নতুন প্রতিবেশীদের জন্য। নতুন প্রতিবেশী বলতে চামাপাড়া লোকজনেরা। কি জানি কেন তারা শুধু তার বদনাম ছড়ায়। নিজের বাড়িতে যখন টিভি লাগাল তা নিয়ে কি কম কথা গেয়েছে তারা? হাজী টিভি দেখবে রে? হাজী হয়েছে বলেই যেন তার সখ আহ্লাদ থাকবে না। তাছাড়া টিভি দেখাতে তো পাপের কিছু নাই। খোদ খোদার মুলক মক্কাতেই লোকে টিভি দেখে। তবে কি হাদীশ কোরানের ওরা কিছুই বোঝে না নাকি?

মক্কাতে ওসব দেখেই তো সে টিভি কিনেছে। তার বিবি বাড়িতে একা থাকে। খোদা তাকে বালবাচ্চা দেয়নি। তা নিয়ে বেচারীর খুব দুঃখ। সেই দুঃখ ঘোচাতেই তো ধুলাউড়ি 'রেডিও-সেন্টার' থেকে ফিলিপস্-এর কুড়ি ইঞ্চি রঙিন একখান বসিয়েছে তার শোবার ঘরে। তার কিছুদিন বাদে একটা ভিসিপি জোগাড় করেছে। ওটাও মক্কাতেই দেখেছিল। কিনবার কথাও ভেবেছিল। কিন্তু ওই টাকায় সোনা আনলে বেশী ফায়দা বলে ওটা নিয়ে আসেনি, সোনা নিয়ে এসেছিল। তাছাড়া ওটার আবার তেমন কাজ কি তার সংসারের এমনই ভেবেছিল সে। কিন্তু টিভিটা কেনার পর ওটার প্রয়োজন দেখা দিল তার সংসারে। প্রয়োজনের অনুভবটা রেডিওসেন্টারের বাক্কার জাগিয়েছিল তার মধ্যে। নানা একখান ভিসিপি লিয়ে ল্যান এবার। নানীতে আপনাতে মুন মতুন সিনেমা দেখবেন। টিভি ফিট করতে এসে বাক্কার তাকে এমন কথা বলছিল। তার পর-পরই ভিসিপি জোগাড়ের ঘটনাটা। এক বাংলাদেশী খরিদ্দার তার, যার কাছে পাঁচ হাজার টাকা পেত সে। কিন্তু লোকটার বহুদিন পাত্তা ছিল না। তবে শুনেছিল লোকটা ধুলাউড়ি বাজারে আসে ঠিকই কিন্তু তার দোকানে ওঠে না। ওঠে অন্য দোকানে। শুনে খুব রাগ হয় তার। এবং লোকটাকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতে। আর সেই ফাঁদে লোকটা ভিসিপি সহ ধরাও পড়ে। নুরুদ্দি হাজী তখন পাওনা টাকার বদলে ভিসিপিটা নিয়ে নেয়।

কোন ছোটবেলায় সিনেমা দেখেছিল নুরুদ্দি হাজী দিলীপকুমার বৈজন্তীমালার গঙ্গা যমুনা—সে সব কিছুই তার মনে ছিল না। কিন্তু ভিসিপিটা হাতে পেয়ে আস্তে আস্তে সব মনে পড়তে লাগল। সিনেমাটা সে দেখেছিল জঙ্গিপুর গনেশ টকীজে। তারপর আর কোন দিন তার হলে যাওয়া হয়নি। খাওয়ার সময়ই পায়নি। তাছাড়া সিনেমা দেখার মতো ফুটানি করবার মতো সামর্থও ছিল না। বাপের সঙ্গে হপ্তায় সাতদিনই হাট করে বেড়াত এখানে ওখানে। আর যখন সামর্থ হল তখন তার গালে ভাদই ধানের মতো বাহাল দাড়ি। তা বাদেও ততদিনে ধুলাউড়ি মাঠে রোদবৃষ্টিতে দেহাতি মানুষের নামাজ পড়ার দৃশ্য তাকে দিয়ে মানত করিয়ে নিয়েছে সেখানে একটি

মসজিদ তৈয়ার করিয়ে নেবার। সে কি তখন সিনেমা দেখতে হলে যেতে পারে?

না যেতে পারে নি। তবে সিনেমার প্রতি বিশেষ করে দিলীপকুমার বৈজন্তীমালার সেই মধুর জুটি তার মনের কোন অতল খাদে লুকিয়ে ছিল ভিসিপিটা হাতে পেয়ে সেটা ফিরে পেল সে। এবং ওই ভিসিপিতে প্রথম দিনই সে গঙ্গা যমুনা সিনেমাটি দেখেছিল বিবিকে সঙ্গে নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। তারপর আজ পর্যন্ত তারা দুজনে অনেক সিনেমা দেখেছে। মগরবের পর বাজার থেকে বাড়ি ফিরে তার করার কিছুই থাকে না। কোনদিন এযায় নামাজ পড়ে। কোনদিন ছতর চলে না। যেদিন ছতর চলে না, বিছানায় শরীর এলিয়ে ভিসিপিটা চালিয়ে দেয়। বিবি হাত-পা টিপে দেয়। তখন সে বুঝতে পারে, খোদা খুব সুখ দিয়েছে তাকে। এত সুখ যে বালবাচ্চা না থাকার দুঃখ সে আজকাল মালুমই পায় না।

কিছু দিন আগেও ভাবত আর একটা শাদী করবার কথা। চাঁদতারা বলে একটা মেয়ে। চোরাকারবার করে। তার বিশ্বাস বস্ত্রালয়ে মাল খরিদ করতে আসে। খুব মনে ধরেছিল তার। কিন্তু ব্যবসার উন্নতি, আর প্রতিবেশীদের জ্বলনের কথা ভেবে তার সাহস হয় নি। তা না হোক নিজের বাড়ির ছাদে ডিশ বসিয়েছে সে।

এ-যুক্তিটাও তাকে দিয়েছিল রেডিও সেন্টারের বাক্কার। ভিসিপিটার কি যে হয়েছে ছবি কাঁপছে শুধু। সেটা ঠিক করতে এসে বাক্কার যুক্তিটা দেয়। নানা বাড়িতে একটা ডিশ বসিয়ে ল্যান। ছবি কাঁপার ঝামেলা থাকবে না, তার উপর অনেক গুলান চ্যানেল। যখন যা খুশী দেখবেন। কুনোটায় খালি গান কুনোটায় খালি সিনেমা। আপনাতে নানীতে দু'জনায় দেখবেন।

বাক্কারের কথা আবারো তার মনে ধরে যায়। বলে, লাগান দিস্। সেই কথার ভিত্তিতে গেল রাতে বাক্কার ওটা লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। কিন্তু ওটা লাগাতেই অনেক রাত হয়ে গেছিল বলে পুরো ব্যাপারটা নুরুদ্দি হাজীর দেখা হয় নি। তাই সে মগরবের নামাজের বাড়ি ফিরবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু খরিদ্দারের চাপ। এমন সময়ে স্থানীয় খরিদ্দার বেশী হয়। তাদের বিদায় করতে এযার ওয়াক্ত হয়ে এল। অন্য দিন এমন হলে এযার নামাজ পড়ে তবেই বাড়ি ফিরত। অথচ আজ তার নামাজ পড়ার কথা মনেই হল না। কালাম তাহেরকে দোকান গুছাতে বলে সে নিজে ক্যাশ গুণতে বসল।

নুরুদ্দি হাজী নিজের বাড়ির দুয়ারে পৌছে টের পায় এই আঁধারেও গিধনীর দল বসে অছে তার বাড়ির সামনেকার মাঠটায়। ফুক্-ফুক্ বিড়ির আগুন জোনাকির মতো জ্বলে। গুজগুজ ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ হয়। নুরুদ্দি

হাজীর তখন মনে হয় গিধনীর পালে সে একটা গরু। এই বুঝি ওরা তাকে ছিঁড়ে খাবে। নুরুদ্দি হাজীর ভয় হয়। আর ঠিক তখনি বিবি মর্জিনা দরজা খুলে দেয়। হাঁফ ছেড়ে নুরুদ্দি হাজী ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে।

স্বামী ঢুকে যেতে আবার দরজা লাগিয়ে দেয় বিবি মর্জিনা। আর ওটুকুর মধ্যে রাস্তার ওপাশে বসা গিধনীর দল বিজলীর রোশনায় বিবি মর্জিনার টুকটুকে মুখ মোলায়েম ফর্সা দুখানা হাত দেখে ফেলে। তখন নিজেদের ভাগ্য নয় ওরা অভিসম্পাত দেয় মর্জিনার ভাগ্যকে। হাজীর বদলে তাদের ধরে যদি মর্জিনা থাকত তারা কে কি করত, কিভাবে মর্জিনাকে রাখত—তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ওদের নিজেদের ভিতর। আলোচনা চলতেই থাকে।

এভাবেই রাত গভীর হবে যেমন যেমন নুরুদ্দি হাজী মর্জিনার সঙ্গে ডিশের চ্যানেল ধরে রঙিন স্বপ্নে বিভোর হবে। বাইরে ওদের আলোচনা তখন আরো জোরদার হবে। ওরা ভুলে থাকবে নামাজের কথা, রোজার কথা, হজের কথা, জাকাতের কথা—এমনকি নিজেদের বালবাচ্চা-বউ-সংসারের কথা।

নুরুদ্দি হাজী কিন্তু এবার নামাজ ভুলে থাকলেও ফজরের নামাজ ভুলবে না। কিম্বা ভুলবে না ধুলাউড়ি বাজারে একটা মসজিদ গড়ার স্বপ্ন। খোদার ঘর মসজিদ। খোদার কাছে তার মানত আছে।

চেনা-অচেনার বাইরে

বিমান চট্টোপাধ্যায়

আঃ! জ্যোৎস্না তো নয়—চাঁদ যেন উঁচু থেকে সহাস্য প্রিয়ার আহ্লাদ বিলিয়ে দিচ্ছিল। প্রতিটি দম্পতির জন্যে অকৃপণ। পার্কের অন্ধকার থেকে উঠে আসছে আশ্লেষ চুম্বনের পরবর্তী যূঁইয়ের গন্ধ। আদিবাসী পাড়ার তাল মাতালে বাতাসও যেন এখানে—এই লৌহনগরীর মাঠঘাট খাচ্ছে বুঁদ।

* * * * * * * * * * * * * * * *

ভাবনার এমন মজায়, ভজার মুদিখানা বন্ধ দেখে, হাঁটতে হাঁটতে ফিরছি। দূরে, কোন্ বিয়েবাড়ি থেকে সানাইয়ের একটা বেহাগী সুর ভেসে আসছিলো। 'বাড়ীর দরজায় কম্বল কেনা মানে, ডাহা ঠকা'—বলতেই, শীলা খিঁচিয়ে উঠলো।—হ্যাঁ, আমি যা কিনছি, সবই ঠকছি। তোমার সব পয়সা তো আমিই ঠকে ঠকে শেষ করছি? আর তুমি যে পরশু বাড়ীর ওপর সস্তায় পেয়ে, সুজি-মেশানো পোস্ত কিনে বসলে? তুমি ঠকোনি?

গুষ্টির বেহাগী সুরকে মাছি তাড়ানোর মত তাড়িয়ে, পাল্টা আমিও—! —তুমি তো সেটা নেচে নেচে রাঁধলে, খেলে। ধরতে পারলে ঠকানোটা? পালবাবুর মুখে শুনে, তবে জানলে। তাছাড়া, আমি ঠকি, সেটা অ্যাক্সিডেন্ট। তুমি ঠক্ছো— জেনেশুনে। প্রতি পদে। বাড়ীর ওপর পেয়ে পচা মাছ কিনে, ফেরীওয়ালার গোছা গোছা উল কিনে। বাসনওয়ালীকে নতুন প্যান্ট বিলিয়ে। মাথায় কি আছে? পয়সা যেন খোলামকুচি।

জ্যোৎস্নায় ভেসে ভেসেই শীলা আবার—থাম—থাম—বকোনা। যূঁইয়ের গন্ধ যেন পুঁইয়ের গন্ধ—এমন 'নিকুচি' মেজাজে শীলা ফাটলো আবার—চুপ করো! তোমার বড্ড অহংকার—না? আমি মাথামোটা আর তুমি ইন্টেলেক্চুয়াল—অতি চালাক। তুমি ঠকো না?

এইসব খিট্কেল কথাবার্তার মধ্যে হারিয়ে গেল আমার জ্যোৎস্না আর যূঁই ফুঁইয়ের গন্ধ। আসলে 'বিভাস' পত্রিকার আগামী গল্পসংখ্যার জন্যে সম্পাদকের একটা জোর তাগাদা ছিল। পুরোনো পাড়ার মায়াবতীদের বাড়ি থেকে হেঁটে ফিরছিলাম। শীলার বান্ধবীর বাড়ি। ওরা বাড়ির ওপর কাশ্মীরি ফেরিওয়ালার কাছ থেকে সস্তায় কম্বল কিনেছে। কিন্তু আমি এতে ঠকে যাওয়ার ভয়ে শীলাকে বারণ করেছিলাম। সেটাই সূত্রপাত।

যূঁই আর জ্যোৎস্না যখন কুঁড়িধরা গল্পটাকে পাপড়ি মেলতে ওম্ জোগাচ্ছে, তার সঙ্গে শীলার পরণের 'সাতরঙা রামধনু নেমে এল অঙ্গে'—মার্কা আজই পরা নতুন শাড়ীটা একজোট, তখনই সুজি মেশানো পোস্তর অ্যাটাচটা এল। সঙ্গে সঙ্গে বস্তা মাথায়, নিরীহ্ সাজা, ঠক্দার লোকটার মুখ ভেসে উঠলো চোখে। শালা—ধোঁকাবাজ! ওই লোকটার জন্যেই আমার প্রেস্টিজটা যাচ্ছে এখন।

বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম—শীলার দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে রক্তাক্ত আমি ঝুলছি—! গল্পের রক্তটাও মিশে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে—ঠকোনি তুমি? নিজের প্যান্টের ছিট, পচা আলু, পাকা পেঁয়াজকলি, কাঁচা টমাটো, ভেঁপনো ধরা আটা—কত বলবো? অ্যাঁ—লেক্চার দিচ্ছ যে—!

জ্যোৎস্না আর গন্ধ যখন হারিয়ে গেছেই, তখন আমিও ছাড়ার পাত্র নই। বললাম—ধ্যুৎ তেরিকা—। ওগুলো ঠকা নয়। জেনেশুনে কম দামে কেনা। বুঝেছ? তোমারটা জেনুইন ঠকা। ঠকাবার আগে কেউ 'বৌদি', কেউ 'কাকীমা'—। ব্যস, গলে গেলে। ভাবলে, সত্যিকারের আত্মীয়—কোথায় যে ছিল এতদিন?—আহা!

—ঠিক আছে। তুমি এর জবাব একদিন—

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই, কে যেন পাশেই সাইকেল থেকে ধুপ্ করে নামলো।

—কাকু, কেমন আছেন?

আবার কে? তাকিয়ে দেখি, আমার বয়সই একটা লোক আমাকেই 'কাকু' ডাকলো। এই এক স্টাইল হয়েছে আজকাল। বয়সের গুষ্টির তুষ্টি হয়ে যাচ্ছে। যে যাকে আগে 'কাকু' ডেকে দিতে পারে। ঝাঁপিয়ে ভাইপোর পোস্ট জবরদখল—।

শীলা এক ঝটকায় থেমে গেল। আড়চোখে লোকটাকে দেখে পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো। শুরু হলো আমার স্মৃতি হাতড়ানো।—কে লোকটা?

তবুও বললাম—ভালো। তুমি—ইয়ে, আপনি কেমন আছেন?

লোকটার উত্তর—এমনি ভালো। তবে মাঝে মাঝে পেটের ব্যামোতে ভুইগ্ছি। আমাশা। দুগ্গোপুরের জলটা তো ভাল লয়—বুঝলেন আজ্ঞা? উত্তরটা কানে ঢুকলো না আমার। কারণ শীলাকে তখনও মানানো বাকি যে, ওর বাইরের ঘোঁতঘাঁত সম্বন্ধে জ্ঞানগম্যি কম। লোক ওঁৎ পেতে আছে নানা শিল্পসম্মত কায়দায় ঠকাবার জন্যে।

লোকটা বললো—আপনার সইন্গে অনেকদিন পর দেখা। কাকীমাকে লিয়ে কি বাজারে—? তো, বলেন আঁজ্ঞা, আছেন কেমন?

বললাম—ভালো। কিন্তু বলতে পারলাম না—ভালো নয়। শীলার যখন তখন লাগামছাড়া আক্রমণ। সেজন্যে গল্পটা হারিয়ে গেল—বেশ কষ্ট। আর তাছাড়া, তুমি-ই বা কে? এমন ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা যে, লজ্জা করছে জিজ্ঞেস করতে, নামটা কি বলুন তো? হয়ত অপমান বোধ করবে। তা, এগুলো যে ভালো থাকা নয়, ওকে বলতে পারছি না।

মুশকিল হয়েছে কি—আমার অনেকগুলো ফ্রন্ট। চাকরী, সাহিত্যের লেখালেখি, সংসার, আশিটা জমির প্লট হোল্ডারদের উন্নয়নের সেক্রেটারিগিরি সদ্য ছেড়েছি, তার তলানির হ্যাপা, খানিকটা সখের সাংবাদিকতা করা ইত্যাদি। এখন, এই লোকটা কোন্ ফ্রন্টের, কিছুতেই মগজে আসছে না। কথাবার্তায় একটু আন্দাজ পেলেই, চতুরভাবে ধরে ফেলবো। লোকটার শিক্ষা ওকে ক্যামোফ্লেজ দিতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে, ওকে যে কত নিবিড়ভাবে মনে রেখেছি, তা, কথার কারিকুরিতে বুঝিয়ে দেব ঠিক। কিন্তু লোকটা কোন্ ফ্রন্টের, লিক্ করছে না এতটুকু। ফলে, আমাকে কম কথা বলে ওকে বেশী বলাতে হবে।

বললাম—তা, এদিকে কোথায়?

বললো—টুকুন চণ্ডীদাস বাজারে সব্জী লুবো। আমি ফি শনিবার রাত করে উখান্‌কে বাজার করি। টুকুন শুঁকাই যায় বলে, অনেক কমেই দিইন দ্যায়। রবিবার ছুটির দিনে 'ফেরেশ' আমদানি অনেক তো?

বললাম—ঠিকই।

লোকটা পিচিক্ করে থুতু ফেলে বললো—আর যা জিনিযের দাম। আমাদের অবস্থা খারাপ হয়েঁ যাচ্ছেক্।

একটা কথা বুঝলাম যে, লোকটা পয়সাকড়িতে ল্যাংড়া পা টেনে টেনে হাঁটছে। কিন্তু তাতেও কোন্ ফ্রন্ট, নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। কথা গড়ালো আরও—আপনাদেরও শুনছি কি, কারখানার অবস্তা ভাল লয়? বেতন দেরি হবেক্—বন্ধ থাকতে পারে। ইসব বটে কি?

বললাম—হ্যাঁ। ঠিকই। মাল বিক্রি হচ্ছে না তেমন।

—কেনে ইটো হচ্ছেক্?

—ওই বিদেশী মাল ঢুকে বাজার দখল করে নিচ্ছে।

একটা ফ্রন্ট বাদ। অর্থাৎ চাকরীর ফ্রন্টের লোক ও নয়। তা যদি হত, তাহলে 'আপনাদেরও কারখানা' কথা বলতো না। আমি হাঁটতে হাঁটতে ওর পায়ের দিকে তাকালাম। সস্তার প্লাস্টিকের চটি। জামা-প্যাণ্টও খানিকটা ময়লা পুরোনো। পাশে হাঁটার জন্যে মুখটা দু'একবার ঘাড় ফিরিয়ে যা দেখছি। তা-ও দোকানের হাত না পৌঁছানো আলোতে। তাতে, কোথায় দেখেছি, কিছুতেই মনে করতে পারছি না। অবশ্য লোকটা যতটা হাঁটে, আমার ভালো।

জানি, ও চলে গেলেই, শীলা আমাকে আবার হাফ্‌সেদ্ধ থেকে পুরোটা পিষবে।

লোকটা বললো—এখনও কোম্‌পানির কোয়াটারকে রঁইচেন? ঘরবাড়ি বানাইবেন নাই?

বললাম—লাইট-ফাইট না এলে কি করে করি? লাইট ছাড়া বাস করা খুব অসুবিধে।

—ঠিকিঁই বুলেছেন। টন্‌শীপের বাইরে, সীমানা-গাঁয়ের জমিগুলান লাইট পাঁয়ে যাবেক, কবে থিকে শুইনছি। আমাদের প্লটগুলানের লিয়মমত টেকা কবেই তো জমা পড়ে গেছেক্। তুবুও পোল পড়লেক্ নাই একটাও।

ভাবছি, লোকটার উদ্দেশ্য কি। এখন তো লোকের অকারণ অমায়িক ব্যবহার দেখলেই ভয়। রং-করা বিষাক্ত সরবৎ নয় তো! রং দেখে খেয়েছ কি স্লো পয়সনের ফাঁদে। ধান্দার কোনো ছবিই তো এখনও আমার অ্যাণ্টেনায় ধরা পড়েনি।

হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, ও শীলাকে ভালো করে আলোতে দেখার জন্যে—কথা বলার জন্যে—সঙ্গ পাওয়ার জন্যে, হাঁটছে না তো? শীলার সবে শুরু কিছু কিছু পাকা চুল ও দেখতে পাচ্ছে না। কারণ অত আলো নেই রাস্তায়। 'কাকীমা' বলে ডেকে, তার সম্বন্ধে এমন ভাবা—! সেকি হয়। না হওয়ার-ই বা কি আছে? নামাবলী চাপানো এসব সম্ভ্রমের টেংরি চিবোতে আমি কতবার দেখেছি। লেখালেখি, দর্শন-ফর্শন ঘাঁটাঘাঁটি করি বলে খানিকটা 'ইনার আই' পেয়েছিলাম। ফলে, মাঝেমধ্যে বেঁচেও যাই। নইলে অনেক ইমানদারের রাতচোর হাঁটাকে পূজ্যপাদ চরণ দেখতাম।

মানে, শীলাকে নিয়েই যদি ধরি—। তেইশ বছরে যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন ওর রূপ-যৌবনের গ্রেডেশানটা সঠিক করতে পারিনি। এটা বুঝেছিলাম, শিক্ষিতা-সুন্দরী ব্যাপারটা সত্যিই ঘটে গেছে। কিন্তু কতটা সুন্দরী? ফিল্মস্টারদের একশ' নম্বর দিলে, শীলা কত পেতে পারে? সে-টা বুঝতে যেগুলোকে টুলস হিসেবে ব্যবহার করতাম. তা—এক, শীলা ও আমি ছবি তুলতে স্টুডিওয়ে গিয়েছিলাম, ফোটোগ্রাফার শীলার মুখের ও ভঙ্গিমার অনেকগুলো ক্লোজ-আপ্ ছবি বিনে পয়সায় তুলে নিজের সো-কেসে পাব্‌লিসিটির জন্যে সাজিয়ে রেখেছিল। দুই, কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে, শীলার কাশ্মীরি ড্রেসপরা ছবি দেখিয়ে আমি শীলার অচেনা একজন লোককে বলেছি—মেয়েটি কাশ্মীরি সিনেমার ছোটখাট একজন। সে সটান বিশ্বাস করেছে। তিন, রাস্তার ওপার দিয়ে আসা লোক, পথ পেরিয়ে এপারে, মুখোমুখি। চার, বয়স্ক-মিস্ত্রি-গ্যাসওয়ালা-যুবক জল খেতে সময় নিয়ে আর বেশী করে শীলার সঙ্গে কথা বলতে চাইত। এসব অনেক।

কিছুটা হিংসে থেকেই বুঝতাম, বন্ধুরা বলতো, ওই বউ তোর মানায়? বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। আমি বাঁদর? একটা লেখককে বাঁদর বলা? অথচ বিয়ের পরে আমার ডাক্তার মেশোমশাই আমাদের কোনো একটা জয়েণ্ট ভক্তিভাবের পোজ বা মোমেণ্টে দেখে রায় দিয়েছিলো—'মোস্ট ম্যাচিং'। ওটাই বোঁচানাক বউওয়ালা বন্ধুগুলোকে শোনাতাম রাগে।

কিন্তু রাতে, ইয়ে, মানে, বাহুডোরে বাঁধা এবং আরও বাঁধাবাঁধিতে বেঁধে—সত্যি বলতো, তুমি কি আমাকে বিয়ে করে ঠকে গেছ?

কি আবেগ আর প্যাশানমাখা উত্তর তখন—ছিঃ! এসব উচ্চারণ কোরো না কখনও।

আবার পাল্টা বলেছে—বরং তুমি বলো—তুমি কি আমাকে নিয়ে ঠকেছ?,

উত্তরে—সে আর কি বলবো? তুমি বোঝোনি? আমরা কেউ কাউকে ঠকাইনি। উই আর মেড ফর ইচ্ আদার। আর এই বাইশ বছরে, শীলা আমায় বাইশবার তো বলেইছে বরং একটা শূন্য বেশী—ও আমায় বিয়ে করে ডাহা ঠকে গেছে। কখনও বুদ্ধিতে কম, কখনও পয়সায় কম, কখনও রূপে, কখনও বয়সে, কখনও সংসার না বোঝা একটা ঢ্যাড়স, কখনও অন্য এগারোটা স্বামীর কম্বিনেশান না হয়ে ওঠার জন্যে এবং শেষমেষ মায়াবতীর বাড়ীর কাশ্মীরি শালওয়ালার কাছ থেকে কম্বল না কিনতে পারার জন্যে।

অথচ সে সময় জিনস্-এর প্যাণ্ট আর সোলডার ফ্ল্যাপ ডবল বুক-পকেট শার্টে ম্যাসকুলিন বোল্ড ফিগার ওই-ই আগ্‌লে রাখতো। এখন অবশ্য পাকা ঝুল্‌পি আর মাথার তালুতে সেন্ট্রাল দীঘি ফুটবে ফুটবে করছে। মুখের ভেতর গোটা দশেক দাঁত রেখে, বাকিসব গাঁদাফুল তোলার মত ডাক্তার তুলে নিয়েছে।

লোকটা প্রসঙ্গ পাল্‌টে বললো—কাকু, বইলিখা, খবরলিখা, সব এখনও চলছেক্ তো আপনার?

—চলছে। স্বগোতক্তির মত উচ্চারণ করলাম—আর লিখেও কিছু করা যাচ্ছে না।

—কি করা যাচ্ছেক্ নাই?

—এই যা করতে চাই। তারপর সাংবাদিক নিগ্রহের ওপর স্থানীয় কাগজে একটা পোস্ট-এডিটোরিয়াল করেছিলাম, তার টাইটেলটা ওকে শোনালাম।

—'মসীর চেয়ে অসি আজ ঝলসে বেশী'!

লোকটা কথাটা বুঝেছে। একটু যেন উত্তেজনা—ঠিকি বুলেছেন। রাজনীতি লেমেছে দেখেন কুথাকে। সাহেবদের দেশগুলানের উন্নতিটা একবার দেখেন? পন্-চাশ বছর ধর‍্যে স্বাধীনতা—কম দিন, বলেন? কি পালাম?

একটা কথা বুঝলাম, লোকটা লেখালেখির ফ্রণ্টে যুক্ত নয়। আচ্ছা মুশকিল! কিছুতেই মনে পড়ছে না ভদ্রলোকের পরিচয়। আর আমারও গোঁ—ওর কথার সূত্র ধরে পরিচয় বের করবই। কোনো কাজে লাগুক ছাই না লাগুক।

ঘরে ঘরে ধূপধুনোর গন্ধ, শঙ্খধ্বনি ও রামকৃষ্ণের চরণ ছুঁয়ে, ইস্পাত-গৃহস্থের ভরন্ত সংসার সন্ধ্যার রূপ দিচ্ছে। লোকটার ক্ষোভে আমার মনে হল, ব্লাস্ট ফার্নেসের বাঁটে দুঃস্থ ইউনিয়নের বড় দেরি করে ফেলা দোহন টান। স্নেহশেষ সে বাঁটে, তপ্ত লাল 'টনেজ' আজ ক্ষীণতম। তবুও যূঁই, চামেলী, উল, স্বামীর টিফিন ইত্যাদির সরলতা দিয়ে বিগত যৌবন না-বুঝ গৃহস্থ ঢেকে দিতে চায় 'রোলিং মিল-এ অর্ডার নেই' খবরের হেডিং।

বিগত যৌবন হলেও, শীলার কিন্তু পশ্চিমে ঢলা এখনও যা আছে, তার সঙ্গে একটু বয়স্ক রোমান্স—মানে, আমার গল্পের ভেতর আমাকে, যদি ও তেমন করে একটু চিনতো—হায় কপাল। তাহলে হয়ত, পোস্তের মধ্যে সুজির মিশেল আর ওর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে 'নিকুচি সাহিত্য'-এর মিশেল এক করে দেখতো না।

লোকটা বললো—দেখুন কাকু, মানুষের সততা বলে আজকাল কুছুই নাই। কেউই কারর লেগে ইখন আর টুকুন দুঃখ পায় না। চিন্তাই করে না।

ভাবলাম—তবে কি লোকটা রাজনীতির লোক? কিন্তু বেশ খানিকটা দুঃস্থ চেহারা সত্ত্বেও, ভেতরের মূল্যবোধটায় একটা গভীরতার টাচ্ পাওয়া যাচ্ছে, মনে হচ্ছে।

—দ্যাখেন কেনে, মিন্সিপালটি বললেক্ কি, প্লটের রাস্তায় মোরাম ফেইলবেক্। তবে বরাদ্দ যৎসামান্য। জুড়ে গেলেক কিচাং। সুবাই চায় কি, লিজের জমির সামনের রাস্তায় ফেলতে হবেক্-ই। সেক্রেটারি বললেক্ কি, সুবার কুলাবেক্ নাই। যারা বাড়ি করেছে এবং কিনা কইরছেক্, তাদেরটা আগে। কথাটা তো ঠিকি-ই কিন্তুক দ্যাখেন, ইটো লিয়ে লিত্যদিন খেয়োখেয়ি। কাল সেক্রেটারি আমায় ডেক্যেছে।

মুহূর্তে ওর এই মোরাম সংক্রান্ত কথাগুলো শুনেই, আমি ধরে ফেললাম। পেয়ে গেছি। ব্যস! ও জমির ফ্রণ্টের লোক। কারণ টাউনশিপের লাগোয়া গ্রামগুলোর চৌকাঠে পাঁচমিশেলী লোকের পল্লী গজিয়ে উঠেছে অনেক। সস্তা দামের প্লট। যদিও আমাদেরটাও ওগুলোর মধ্যে একটা। মিউনিসিপালিটি সবাইকেই খুশি করছে কিছু কিছু মোরাম বাঁধানো রাস্তা করে দিয়ে। চাঁদা দিয়ে জল আলো নিজেদের করতে হচ্ছে। সত্যিই এই নিয়ে প্লট-হোল্ডারদের রোজ ঝগড়া।

হঠাৎ মনে পড়লো—নতুন সেক্রেটারি আমাকেও খবর পাঠাচ্ছে রোজ। ছ'মাসের দরুণ চারশো টাকা ডেভেলাপমেন্টের চাঁদা বাঁকি। কিছুতেই দিতে যাওয়া হচ্ছে না। হয় সময় পাই না, নয় টাকা নেই হাতে। নয়ত কুঁড়েমি। আবার দশ দশ কুড়ি কিলোমিটারের স্কুটারের তেল পোড়াবো শুধু ওই একটা কাজে?

চিন্তাটার ল্যাজ ধরে কাজ গুছোবার ধান্দা মাথায় খেলে গেল।—আচ্ছা, লোকটাকে কাল সেক্রেটারি ডেকেছে। ও-তো যাবেই। আমি যদি এই সুযোগে আমার চাঁদাটা ওর হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিই। পেট্রলের দামটা আর সময়ও বাঁচবে। কারণ ভজার মুদিখানা বন্ধ থাকায়, ওকে দিতে আসা গতমাসের টাকাটা পকেটেই ফিরে যাচ্ছিলো। টাকা আর সুযোগ দুটোই এসে গেছে।

লোকটা মারফৎ টাকাটা পাঠালে দুটো জিনিষ হবে। এক, স্কুটারের তেল খরচ না করে, কালই টাকাটা পৌঁছে যাবে। দুই, শীলাকে দেখানো যাবে এবং সুপ্রিমেসির পোজ করে বলাও যাবে—কিভাবে নেট-ওয়ার্ককে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজে লাগাতে হয়, দ্যাখো। মেয়েছেলের মোটা বুদ্ধিতে এসব আসে না।

কিন্তু লোকটা কি রাজী হবে উপকারটা করতে? রাজী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ ও নিজেই আক্ষেপ করলো—'কেউ কারর জন্যে আজকাল আর চিন্তাই করে না।' সব থেকে ভাল হত, নামটা মনে পড়লে। আবার নামটা জিজ্ঞাসাও করা যাচ্ছে না। নাম শুনে হয়ত দেখবো, একাধিক বার নামটা ধরে ডেকেছি। কিছু ঘনিষ্ঠতাও কখনো দেখিয়েছি কিনা কে জানে। তেমন হলে, লজ্জায় পড়ে যেতে হবে। হয়ত বলবে—আপনার এত আঠা ছিল, এখন পুরো অচেনা! তার মানে, আপনার মনে আমার একটুও জায়গা হয়নি! সবটাই ছিল নকল, ভণ্ডামি! নাম জিজ্ঞাসা করার রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। ফেঁসে যাব। তাছাড়া, শীলার সামনে যে শ্রদ্ধাটা পাচ্ছি, সেটা গুব্‌লেট হয়ে যেতে পারে।

বড় রাস্তার মুখে পৌঁছে লোকটা বললো—কাকু, আসি। আমি বাঁ-দিক দিয়ে সর্ট-কাট্ কইরবো।

এই রে—! লোকটা চলে যাচ্ছে যে! কোনো ধান্দাই ছিল না তবে? আমার কাজ গুছোনোর ব্যাপারটা বাকি থেকে যাবে নাকি? তড়িঘড়ি কথাগুলো হাফ্ সাজিয়েই বলে ফেললাম। এবং এবার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়ে 'তুমি' সম্বোধন।

—ভাইপো, তুমি তো, কাল সেক্রেটারির বাড়ী যাচ্ছই?

—হুঁ। কেনে?

—তো, আমি তোমাকে চারশ'টা টাকা দিয়ে দিচ্ছি। তুমি সেক্রেটারির

হাতে দিয়ে বলবে, বীরেন চ্যাটার্জি পাঠিয়েছে। ব্যস। আর কিছু বলতে হবে না। ওতেই বুঝবে। যদি আমার নাম ভুলে যাও, তবে বলবে, ওই লেখক-ভদ্রলোক পাঠিয়েছে।

—কি যে বলেন কাকু? আপনার নামটো ভুলো যাব-অ? গুণী লোক আপনি।

আমি আড়চোখে শীলার দিকে তাকালাম। আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম, লোকটা আমাকে 'গুণী' যে বললো, এবং যথেষ্ট জোরেই—সেটা গাড়ির শব্দে চাপা পড়ে যায়নি তো? মানে, শীলার কানে স্পষ্ট ঢুকেছে তো?

যাইহোক, হড়বড় করে চারটে একশ' টাকার নোট লোকটার হাতে ধরিয়ে দিতেই, লোকটা তা নির্বিকার পকেটে ঢুকিয়েই প্যাডেলে চাপ। এক মিনিটেই বড় রাস্তার ভিড়ে হারিয়ে গেল।

এবার শীলা মুখ খুললো—লোকটাকে চেনো তো? ঠিকমত টাকাটা পৌঁছবে তো?

বললাম—বুদ্ধি খাটিয়ে চিনলাম। আর বুদ্ধি খাটিয়েই স্কুটারের তেলটা বাঁচালাম। তোমার মোটা মাথায় এগুলো ঢুকবে না।

শীলা বললো—ভালো। কি করে ঢুকবে? আমি কি তোমার মত গুণী?

কথাটা শীলার কানে গেছে তাহলে। ইউনাইটেড ক্লাবের মুখেই দাঁড়িয়েছিলাম। প্ল্যান্টের অ্যাকাউন্টস্ অফিসার, মোহিত গাঙ্গুলী ডাকলো—বীরেনদা, কেমন আছেন? ক্লাবের গেটে আড্ডা দিচ্ছিলো ও।

বললাম—ভালো।

বললো—ওই সাইকেল-পার্টির সঙ্গে কি বক্‌বক্ করছিলেন? লেখার রসদ কালেক্ট করছিলেন নাকি?

—নাঃ। ইন্দ্রপ্রস্থ পল্লীতে ও আমাদের জমির প্লট-হোল্ডার তো? ওকে ম্যানেজ করে, ওর হাতে সেক্রেটারিকে আমার চারশ' টাকা চাঁদাটা পাঠিয়ে দিলাম।

মোহিত ভ্রু কোঁচকালো—কি! ওই লোকটা ইন্দ্রপ্রস্থ পল্লীতে জমি—? আপনি ওকে চেনেন? না-কি, ও বললো, ইন্দ্রপ্রস্থে জমি কিনেছি?

—না, ও বলেনি। তবে, ওকে কোথাও দেখেছি। ও বললো, প্লটের সামনে মোরাম ফেলা চলছে। মোরাম দখল নিয়ে ঝগড়াও হচ্ছে। সেক্রেটারি ওকে ডেকেছে। আমাদের জমির সেটা ঘটনা।

—আশ্চর্য! সারা দুর্গাপুরের বিশটা পল্লীতে মোরাম ফেলা চলছে। তারও একই ঝগড়া চলছে। আর বিশটা পল্লীর, বিশটা সেক্রেটারিও থাকতে পারে। তাতে জবরদখল আছে, পাট্টা-পাওয়া আছে, খাস আছে—কতরকম কলোনী। লোকটা জবরদখল কলোনীরও হতে পারে?

মোহিতের কথায় মাথাটা দ্রুত গুলিয়ে যাচ্ছিল। মোহিত কি অন্যরকম কিছু বুঝেছে?

বললো—ও কি আপনার ঠিকানা জানে?

—না।

—আপনি ওর ঠিকানা জানেন?

—না।

—তাহলে তো হল।

বললাম—সর্বনাশ! তাহলে কি লোকটাকে চিনতে ভুল করলাম?

—হ্যাঁ। আপনি তাই করেছেন। লোকটা চণ্ডীদাস বাজারে ফুটপাতে পত্র-পত্রিকার হকার ছিল।

—সে কি! ছিল? মানে, এখন নেই?

আমার গালে কে যেন সজোরে থাপ্পড় কষাল। পা-টা অবশ লাগছে। জিভটা শুকনো! তাহলে চারশ' টাকা চোট হয়ে গেল!

বললাম—কালকেই ওকে চণ্ডীদাস বাজারে গিয়ে ধরতে হবে।

—পাবেন না। বছরখানেক হল, ও-তো বসেই না ওখানে। দেখি না কোথাও। তারপর এই প্রথম আপনার সঙ্গে দেখলাম। তবে মুচি হলেও বেশ 'জেন্টলম্যান'-এর মত জ্ঞানগম্যি ঝাড়ে।

—তাহলে কি হবে?

—আশ্চর্য মাইরী আপনার ব্যাপার। আর তাছাড়া দেখুন, ও যদি সৎভাবে টাকাটা ফেরতও দিতে চায়, তো, ও আপনাকে খুঁজেই পাবে না। আর এতক্ষণে ওর দু'টাকার জেট প্লেন ডেন্‌জার জোন পেরিয়ে গেছে। বলে, মোহিত একটু করুণা-মেশানো আক্ষেপ হাসি স্পেয়ার করলো।

শীলার দিকে আড়চোখে তাকালাম। হাত ছয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে। চোখ রাস্তা ছুঁয়ে চুপচাপ। শীলা কি শুনতে পেয়েছে?...ঘুম থেকে জেগে, হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন উদ্ধারের মত মনে আসছে ব্যাপারটা এখন।

কয়েক মাস আগে লেখক-বন্ধু মণিবাবু, এই লোকটার কাছে কাগজ কিনছিলো। হঠাৎ মণিবাবুকে দেখতে পেয়ে, দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ গল্প করেছিলাম। দোকানদারির ফাঁকে ফাঁকে লোকটা আমাদের গল্প শুনছিলো। আমরা সাহিত্য সংক্রান্ত কথাই বলছিলাম। মনে পড়ছে, লোকটা নিজেও বলছিলো—আমি তো হিন্দি সিনেমা দেখিই না। সব অবাস্তব গল্প। তখনই বোধহয় ও জেনেছিল, আমি বা আমরা গল্প লিখি।

পঞ্চাশ পেরিয়েছে। 'স্মৃতি' এবং 'মাথার চুল', দুটোই শত্রুতায় উদারনীতির প্রতিযোগী। আর পাব না বোধহয় টাকাটা। ভীষণ অসহায় লাগছিলো। আর

দশ মিনিট হেঁটে কোয়ার্টারে—। শীলা নিঃশব্দে পাশে পাশে। অসহায় হয়ে পড়লেই দর্শন হাতড়াই।

শীলার দুশো টাকার বাহারী কম্বল ঠেস দিয়ে বলে, বাতিল করেছি। এখন আমি তার ডবল টাকা পিণ্ডি দিয়ে বসলাম। বাড়ী পৌঁছে শীলা কম কথায় বেশ গম্ভীর। পোষাক বদল, খাবার গরম সেরে, মেয়েকে আমাকে খেতে ডাকলো। বুঝতে পারছি—আমার এই ধ্বসে যাবার ব্যাপারটা ও ধরে ফেলেছে। অপেক্ষা করছি—কখন বিস্ফোরণ ঘটে! ঠিক করলাম, স্পোর্টিং স্পিরিট দেখিয়ে নিজেই বলবো। ও অবশ্য ঝাঁপিয়ে পড়ে কম্বলের প্রতিশোধটা সমূলে তুলবে। তবুও খাওয়া সেরে, সুরু করলাম—আজ একটু টেনশানে ঝুলে রইলাম, বুঝলে? জমির চারশ'টা টাকা—।

সঙ্গে সঙ্গে শীলা বললো—ঠকে গেলে তো?

—না-না।

শীলা আশ্চর্য হয়ে বললো—ঠকোনি!

এই মুহূর্তে অসহায় অবস্থাটা যতটা না টাকাটার জন্যে—তার চেয়ে বেশী, শীলাকে আমার চিন্তায় একাত্ম না করতে পারার জন্যে। বললাম—এটা ঠিক ঠকা নয়। এখনও ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছে ও। আশ্চর্য!

—জানো, লোকটা আমায় অনেক দিয়ে গেল। চারশ' টাকার অনেক বেশী। ঠকে যাওয়াটা ঠকা নয়। অজান্তে ঘটে যাওয়া এক ধরনের পুজো। পুজোয় পুণ্য অর্জন হয়। ঠকে গেলে আসে অভিজ্ঞতা। পুজোর দক্ষিণা লাগে। অভিজ্ঞতা পেতে খেসারত দিতে হয়। খেসারত, খেসারত নয়। অভিজ্ঞতা অর্জনের দক্ষিণা। তাছাড়া, লোকটা হয়ত খুঁজে পেতে টাকাটা ফেরতও দিয়ে যেতে পারে কোনোদিন?

শীলা হয়ত এক্ষুণি ফেটে পড়বে—দয়া করে তত্ত্বকথা থামাবে? ঘুম পেয়েছে। অথবা, বলবে তো, বড় লেখকরা এর থেকেও বেশী কাছাখোলা—গয়নার মত, দারুণ মানায়?

বললাম—লোকটা টাকা নিয়ে একটা আস্ত গল্পের জন্ম দিয়ে গেল। ভালো গল্প। দেখো, গল্পটা নিশ্চয়ই কোনো বড় কাগজ ছাপবে।

এবার শীলা যেটা বলবে—নিকুচি করেছে গল্পের! লজ্জা করে না? আমি ঠকলে—। কিন্তু বদলে এই প্রথম শীলা আমাকে বিস্মিত করে অদ্ভুত শান্ত গলায় বললো—বড় কাগজ? লেখো তাহলে? দ্যাখো, কি হয়?

মেয়ের পরীক্ষা। তাই খেয়েদেয়ে সোজা নিজের ঘরে। শীলা একসময় আমার পাশে বিছানায়। এবং সব সত্ত্বেও গভীর ঘুমে—।

রাত তখন নিশুতি! ক'টা বাজে জানি না। হঠাৎ পালেদের বাড়ী ভীষণ জোরে টেলিফোন বাজতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দূরে, দমকলের ঘণ্টার শব্দ।

নিঃসঙ্গ রাস্তাহাঁটা গরু ডাকলো একটা। বাইরে কি কেউ খুঁজছে? লোকটা কি সারারাত আমার ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছে? না—ওটা গরুটার পায়ের শব্দ।

শীলা অকাতরে—। সবুজ নাইট ল্যাম্পের আভায় ওর মুখটা কেমন সরল স্বপ্নমাখা। ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক হয়ে আছে। আঁচল অবিন্যস্ত। সব মিলিয়ে যেন বিয়ের প্রথম বছরের শীলা লাগছে ওকে এখন। মাঝখানের 'দাম্পত্য সংঘাত'-মুক্ত এক নিজের সবটুকু।

লাফিয়ে উঠলো মগজে চারশ' টাকা।—যন্ত্রণা—আঃ! অসহায় অবস্থাটা আবার। বদ্ধঘরে দমচাপা ভাব! জেগে থেকে কেটে গেল একঘণ্টা! আর ঘুম আসছে না। অস্বস্তি! নাঃ—! আস্তে গায়ে হাত দিয়ে শীলাকে ডাকলাম।—শীলা—শীলা—?

শীলা চোখ খুললো—কি হল?

—বলছি—।

—কি বলছো?

—বলছি, কাল তুমি মায়াবতীদের বাড়ী গিয়ে কম্বলটা কিনে নিয়ে এস।

বাঁ-হাতে ঘুম আটকিয়ে শীলা আবার—কেন?

—এমনি। যে টাকা লাগে লাগুক। কাল নিয়ে এস? বুঝলে?

শীলা হাসলো—ঠিক বিয়ের প্রথম বছরের হাসির মত। কি করে যে ও, হাজার বছরের প্রাক্তন প্রেয়সীর নির্ভেজাল হাসিটা হাসলো, কে জানে! তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—মাঝরাতে পাগলামি! ঘুমিয়ে পড়ো তো!

সব অন্ধকার আত্মজীবনী

সোম মুখোপাধ্যায়

দুঃস্বপ্ন বলে কিছু নেই
যা আছে তা এক বুক-ফাটা আর্তনাদ
সেই আর্তনাদে খান-খান হয়ে রাত্রের আকাশে
তারা হয়ে জ্বলতে থাকে নিশ্চিন্ত অসময়
সেই আর্তনাদে ভয়াবহ হাসে ব্রহ্মান্ডের হাঁ-মুখ
আর দেখতে পাওয়া যায় ঊর্দ্ধতন সেই সমস্ত পুরুষদের
যারা মৃত্যুর পরও দেশলাই জ্বালে, সিগারেট ধরায়
দেখতে পাওয়া যায় সেই সমস্ত রমণীদের
যারা বিকেলে রূপচর্চা করে আর ডাকে
আয় আয় আয়
এসো এসো এসো

তবে জন্ম ভাঙা যায়
যেমন ছিঁড়ে ফেলা যায় জন্মের বন্ধন
আর ছিঁড়তে ছিঁড়তে বন্ধনগুলো কখন যেন জোড়া লেগে
মৃত্যু রচনা করে
মৃত্যু মৃত্যুভয়ে চীৎকার করে
সেই চীৎকারের ডাকে সাড়া দেয় বাদুড়
ডানা ঝাপটায় আর ডানা ঝাপটায়
অনুরণিত হয় শব্দ
শব্দেরও রকমফের হয়

আমি এই সমস্ত পেরিয়ে চলি
পেরিয়ে চলি এই সমস্ত অহঙ্কার আর বিনয়
শেষকালে নিজেকে খুঁজে পাই
শাদা বিকেলের দ্বীপে
সেই দ্বীপে জন্মের আগে আমি ছিলাম
সেই দ্বীপে মৃত্যুর পরে আমি যাবো

সময় বলে সেখানে কিছু নেই
দিন বলে আর রাত্রি বলে সেখানে কিছু নেই
মা বলে আর বাবা বলে সেখানে কিছু নেই
ভাই বলে আর বন্ধু বলে সেখানে কিছু নেই
সেখানে লুপ্ত হয়ে যায় পরিচয়
আর হ্যাঁ
সেইখানে প্রেম নেই, কবিতাও নেই কোনো

আছে শুধু গাছ আর পাখি
পাখি আর গাছ
—এরা কেউ আমি ছিলাম
—এরা কেউ আমি হবে
তবে তার আগে সাঁতার দিতে হবে
এক ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে
এক ভয়াবহ ওজনহীন, পরিমাপহীন, পরিনামহীন
অন্ধকারের মধ্য দিয়ে
তোমাকে নিঃসঙ্গ ভুবনডাঙার মাঠে দাঁড় করিয়ে দেবে
সন্তানহীনা ধাইমা
এক অন্ধকার ভোরবেলায়
আর সেইখানে দেখা হয়
আমি ও আমার মতো, আমার মতো ও আমি নয়
অথবা আমার কোনো অতীত আমি
অথবা আমার আমির কোনো ভবিষ্যৎ আমি
অথবা আমার এই হৈ হৈ আমি
অথবা আমার আমির কোনো নিস্তব্ধ বিস্মৃত আমির সঙ্গে

কে ও? স্মৃতি? অথবা বিস্মরণের কোনো অলীক অবয়ব?
কোনো অপরাপর অংশের আমি?
অথবা আমারই কোনো অপরাপর অংশ?
জানি না; শুধু দেখা হল
যেমন দেখা হয়
আর শুরু হল পথচলা
আর শুরু হল কথাবলা

—তাহলে এই মেঘলা বিকেলে ভুবনডাঙার মাঠে
একলা, ভয়ঙ্কর একলা দাঁড়িয়ে বলো
সর্ব ব্রহ্ম, সর্ব অন্ত, সর্ব ব্যোমব্যাপী
উচ্চারিত হোক তোমার পরিচয়; বলো, তুমি
কে? তোমার পরিচয় কি?
—আমার পরিচয় শ্মশানে, গোরস্থানে; আমার
পরিচয় মাটির নিচের সমস্ত খনিজ, আমার
পরিচয় শস্য, আমার পরিচয় ঘাম, রক্ত, পরিশ্রম
আর সারাটা দিনশেষে যখন দেখি
'ছাই হলো সব হুতাশে হুতাশে'
　　　—সেই হুতাশন আমি
আমার পরিচয় শ্মশানের ছাই-ওড়া ছাই-রঙা বাতাসে,
আমার পরিচয় নীরবতার মিনারে
যেখানে শুকুনের চোখে মরকত মণি
—তাহলে তোমার অশ্রু কোথায়?
—আছে, এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে
রেখে এসেছি আমি
—তাহলে বলো, তুমিও কাঁদো?
—আমি কাঁদি না, কাঁদে আমার চতুর্থ ভাগ

—তুমি উট, ছাগল, ভেড়া, মানুষ সম্বন্ধে কি জান? কি জান তুমি টেবিল চেয়ার সম্বন্ধে, চোখের জল, নদীর জল, বৃষ্টির জল এদের সম্বন্ধেই বা কি জান তুমি?

—উট হয়ে দেখেছি আমি, দেখেছি ছাগল, ভেড়া হয়ে; মানুষ বড় ভার চাপায়, মানুষ এদের কাছে ঘৃণিত এক জীবমাত্র, তোমার কাছে এরা যে-রকম

—তোমার কাছে মানে? তুমি কি মানুষ নও?

—তোমার কাছে মানে মানুষের কাছে, মানুষ আমি হতে পারিনি এখনো। আমার সাঁতার, সেই সাঁতার সম্পূর্ণ হয় নি এখনো—এখনো আমি ঢুকতে পারিনি কোনো কুসুমে। সাঁতার চলেছে আমার এখনো এক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আমার এই অবাধ ও দিকদিশাহীন সাঁতার আমার এই সাঁতার শেষ হবে হয়তো কোনো এক বালুচরে হয়তো কোনো এক -অন্ধকার, দুই-অন্ধকার তিন-চার-পাঁচ অন্ধকার আত্মজীবনীর প্রচ্ছদচিত্রে

আর সেখান থেকেই
উঠে দাঁড়াব আমি

ঘুরে দাঁড়াব আমি
নিজেই এক অলীক গল্পকাহিনী, কল্পকাহিনী হয়ে

আমার মাথার ওপরে ঝক্‌ঝক্‌ করছে
সম্পদ আর মারণাস্ত্রের
ধারালো চকচকে তলোয়ার

২
শোনো, তাহলে একটা গল্প বলি

একদিন বোতলে ছিলাম, বিরাট বোতলে
আর সেই বোতল ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছি
বিন্দু বিন্দু হয়ে ছিটকে পড়েছি
আগুনভর্তি এক ভুবনডাঙার মাঠে
তখন কেউ কোথাও নেই, শুধু বিন্দু বিন্দু আর বিন্দু
সেই বিন্দুরা সব্বাই ছিটকে পড়ে হলো প্রাণ
সেই প্রাণেরা সব্বাই হ'লো আমি
সেই আমিরা ছিটকে পড়ে কেউ বা হলাম গাছ
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল অতীতের দিকে তর্জনীর নির্দেশ তুলে
সেই প্রাণেরা কেউ বা হলাম পাখি
উড়তে শুরু করলো তারা ভবিষ্যতের দিকে
আকাশের কালোঘোর তখনো ভালো করে কাটেনি
একটু একটু নীল বেরোচ্ছে যেন
ওই কালোঘোরের ঠিক নিচতলা থেকে
তখন ছোট্ট এই আমি আমরা তুমি তোমরা
খুব ছোট্ট, এই এওটুকুন, খালি চোখে দেখাই যেত না
বইতে বলে যন্ত্র দিয়ে দেখতে হত
তারপর শুরু হল হাঁটা, শুরু হল সংকেত
অতীত থেকে রাস্তা বেরোলো
রাস্তা না, পথ
বেশ, পথ বেরোলো, ছুঁয়ে নিল বর্তমান
চলে গেল ভবিষ্যতে
তখন অবশ্য অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলে কিছুই ছিল না
তবু, তবুও ছিল, অন্ততঃ গল্পের কল্পনার খাতিরে ছিল

আকাশের কালোঘোর তখন একটু একটু করে কেটে গেছে
ধীরে ধীরে কমে আসছে ভুবনডাঙার উত্তাপ
তৈরী হচ্ছে ভূমি আর ভূমিক্ষয় আর ভূমিহার
আর ভূমিহারা আর ভূমিহীন আর লাঠি আর
লাঠিয়াল আর লণ্ঠন আর রাজা আর
প্রাসাদ আর খাজনা আর বাজনা আর পাল্কী
আর বেয়ারা
আর বেয়াড়া একদল বলে বসল ঃ
আমরা এ সমস্ত আর করব না
আমরা মানিনাকো তোমার আইন
হবো টর্পেডো, মহাভারতের ভীমসমান মাইন

আকাশ তখন ঝকঝকে নীল, নীলের মধ্যে এক
ভয়ঙ্কর কালো হাঁ, বিরাট বড় তার জিভ,
সে জিভ বাড়িয়ে সব খেয়ে নেয়
ত্রিসীমানায় নেই এমন সমস্ত সে খেয়েছে
দশ সীমানায় তার জন্য কোনো খাবার নেই
সে উল্কা খায়, পিন্ড খায়, উল্কাপিন্ডও খায়
তবে তারও মৃত্যু অস্বাভাবিক রকম স্বাভাবিক
খেতে খেতে সে বমি করে
ওগরায় নিজেকে, নিজেকে ওগরায়
আর ওগরাতে ওগরাতে সে একদিন
৯ ৮ ৭ ৬ ৫ .... থেকে ক্রমশঃ শূন্য হয়
তবে তার আগে সে ঘড়ি বন্ধ করে রাখে
সে হাঁ-মুখে ঘড়ি চলে না
সময় চলে না, নিশ্চল সময়
১ তারপরে শূন্য শূন্য এইরকম কতশত শূন্য
আর শূন্যের মত স্তব্ধ সময় আর অসময়
সে বেঁধে রেখেছে
তাই তার মৃত্যু হ'ল
তবে সে মৃত্যুর আগে উর্দ্ধতন আর অধস্তন
সমস্ত পিতৃপুরুষ আর মাতৃমহিলাকে দেখিয়ে দেয়
এক ত্রিভূজের মধ্যে
কখনো শাদা কখনো কালো সে ত্রিভূজ

সে সব রং দিয়ে দেয় আর সব রং নিয়ে নেয়
তাই তার আর অন্য কোনো রং নেই

এদিকে ভুবনডাঙার মাঠের সেইসব গাছ, সেইসব পাখি,
সেইসব আমি আমরা তুমি তোমরা একটু একটু
করে বড় হচ্ছে, মাঠটা বড় একলা ছিল
আর মাঠটাকে ঘিরে ছিল এক বিরাট জলাশয় ,
তোমরা যাকে বলো সমুদ্র
মাঠটা ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল, রাগে ফুঁসছিল
একদিন তার রাগ ফেটে বেরোলো ভেতর থেকে
জলাশয়ের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে সাঁতার কেটে কেটে
তারা নিজেদের ঠিকানা পেল

৩

আসলে সে মহামানব
সঙ্গমের মুহূর্তে মুমূর্ষু পিতার নাভিশ্বাস সে শুনেছিল
কুণ্ঠিত হয় নি তাই সঙ্গমশেষে পিতার মৃতদেহে চোখের জল ফেলতে

আসলে সে মহামানব
মৈথুনের সময় শুনেছিল স্বামীহারা তার মায়ের হাহাকার
আর তৃপ্ত হয়ে মাকে বলেছিল,
'আমি তো আছি মা'

আসলে সে মহামানব
আর সে বলেছিল
এই অবাস্তব লেখনীর মধ্যে সে ঠিক এই জায়গায় বলেছিল
এমন এক প্রচেষ্টা নিক্ষেপ হওয়া দরকার
এই ব্যর্থ পৃথিবীতে এমন এক চেষ্টাকে ছুঁড়ে দেওয়ার দরকার
যাতে আর না থাকে শোক, ক্রোধ, নাভিশ্বাস, হাহাকার
যাতে মুহূর্তের অপেক্ষায় এই সবই রূপান্তরিত হয়
রূপসীর হাসি দেখার মত আনন্দে

আসলে সে মহামানব
সে থুতু, থুতু নিক্ষেপ করেছিল সময়ের জঠরে

তাই তো সপ্তসিন্ধু
তাই তো তেরোনদী
তার হাঁ-মুখ, ভয়ঙ্কর হাঁ-মুখ
ওই চেয়ে দ্যাখো তার হাঁ-মুখে
সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা
আর তুমি
আর সে
হ্যাঁ, সে নিজেই নিজের হাঁ-মুখে
তার হাঁ-মুখের একদিকে এক-ব্রহ্মান্ডব্যাপী অতীত
তার হাঁ-মুখের অন্যদিকে এক-ব্রহ্মান্ডব্যাপী ভবিষ্যৎ
শুধু বর্তমান, বর্তমানই নেই কোনোখানে

তার ওই ব্রহ্মান্ড সমান হাঁ-মুখে খাবার নেই
তার হাঁ-মুখে তারই জন্য খাবার নেই কোনো
ওই দ্যাখো, সে ছটফট করছে
খিদের জ্বালায় সে ছটফট করছে
সে অনন্তকাল ধরে ছটফট করছে
তার ছটফটানি অনাদি
তাই তার মৃত্যু হয়
তাই তার মৃত্যু হল
এক অন্ধকার ভোরবেলায়

সেই থেকে সে শুয়ে আছে খরায় ফুটিফাটা মাঠ হয়ে
ব্যাঙের পিঠের মত আদিগন্ত এই ব্যর্থ পৃথিবী তারই মৃতদেহ
তোমরা হাঁটো, হেঁটে হেঁটে চলে যাও
সবুজ ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে
জানো কি তোমরা, সে জীবন দিয়ে যা পারেনি
মৃত্যু দিয়ে তাই পেরেছে
মৃত্যু দিয়ে সে তার সমস্ত রক্তবিন্দুকে
ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে
তৈরী করেছে সবুজ ঘাস, সবুজ পাতা
আর সমস্ত ফুলগাছ
তোমাদের লজ্জা হয় না এই সমস্ত কেটে নিতে
এই সমস্ত কেটে ফেলে নাগরিক বাথরুম বানাতে

তাই সে গজরায়, গরজে গরজে ওঠে

চোখের সামনে ধুলিসাৎ হয় লাটুর

৪
দমআঁটা না দমফাটা, কালো না আলো
মাতৃগর্ভ—
দমআঁটা না দমফাটা, ঠান্ডা না গরম
মাতৃগর্ভ—
বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছি না
ওপরে উঠছি নাকি নিচে নামছি
ভূকেন্দ্রে নাকি মাটির তিনধাপ নিচে
বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছি না
মাথার খুলি ফাটিয়ে দিচ্ছে কোন কোন পাথর
নাকি কোনো চন্ডাল লাঠি মেরে ফের চিতায়
শুইয়ে দিচ্ছে মৃতদেহ আমার
পুড়ে যাচ্ছি নাকি দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসছি
বুঝতে পারছি না

দিন নাকি রাত্রি
রাত্রি নাকি দিন
নাকি দিনরাত্রির সীমানা
উঁচু বাড়ি নাকি নিচু বাড়ি
ছাদ নাকি উঠোন
বুঝতে পারছি না

বুঝতে পারছি না
লাফিয়ে পড়বো নাকি হেঁটে যাবো

আজ রাত্রি কাল দিন, আজ দিন কাল রাত্রি

দিনরাত্রির চুল শক্ত মুঠোয় ধরে
কে যেন ঝাঁকাচ্ছে
মুখ দিয়ে ফেনা, সময়ের আর অসময়ের
আর সময়ের বাইরের ফেনা, ফেনার সমুদ্র
আর সাঁতার, তলিয়ে যাচ্ছি
হাতড়ে হাতড়ে আবার উঠছি
আবার তলাচ্ছি আবার উঠছি
এইরকম উঠতে উঠতে
এইরকম তলিয়ে যেতে যেতেও সাঁতার দিচ্ছি
যেন মাছ
ওই ওইখানে ডাঙা, আর ডাঙা মানে

মৃত্যু

মৃত্যুতে পৌঁছতে হবে

উপসংহার

গ্রীষ্মকাল হাতড়াও, মরুভূমি এবং আকণ্ঠ তৃষ্ণা
বর্ষাকাল হাতড়াও, বৃষ্টি এবং আগুন-ভরা জল
শরৎকাল হাতড়াও, অকালবোধন, বানভাসি
হেমন্তকাল হাতড়াও, একজন মানুষ, ধুতি পাঞ্জাবী,
　　আনমনা চিত্তে একা, বিষন্ন বিকেল
একচিলতে বিকেলের আকাশে অনেক শকুন
হাজার বছর ধরে পথহাঁটা এই পৃথিবীর পথে
শীতকাল হাতড়াও, গোল হয়ে বসা
　　আগুন পোয়ানো যত দেশোয়ালি ভাই
বসন্তকাল হাতড়াও, পাতার পোশাকের অমোঘ স্বপ্নোচ্চারণ
"একবার 'ফাল্গুন' শব্দ উচ্চারণ করো
একবার বলো আজ দোল, বলো এই
　　এই আবির তোমারও
বলো সমস্ত পলাশগাছ তোমার বন্ধু,"

জীবন হাতড়াও, জীবন

সব পেয়ে যাবে যা যা এই গল্পে লিখে যাচ্ছি
বিভোর হয়ে লিখে যাচ্ছি.......কল্পনা, অধি
আঁর পরাবাস্তবতা
সব সব সব
কি নেই, সব আছে.....সব পেয়ে যাবে
এক অন্ধকার ভোরবেলায়

বুঝতে পারি মৃত্যু বলে কিছু নেই
যা আছে তা রূপান্তর
বুঝতে পারি গোটা জীবনভোর
ভাঙা কাচের টুকরোর মত ছড়ানো রয়েছে
গানের কথা, বিস্মৃতি, আত্মপরিচয়, আত্মজীবনী
সব অন্ধকার আত্মজীবনী
বুঝতে পারি ক্রোধের রং কান্না
উল্লাসের রং বিচ্ছেদ
হুল্লোড়ের রং ঔদাসীন্য
জীবনের রং জীবনানন্দ দাস

এরপরেও কি দুঃস্বপ্ন বলে কিছু থাকে
এরপরেও কি থাকে বুকফাটা আর্তনাদ
কিছু নেই-ও
শুধু আঘাত আঘাত আর আঘাত
আর এই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হতে হতে
ক্রমশঃ বুঝতে পারি
ভুল বলেছি
মেঘলা আকাশের নীচে
নীল আকাশের নীচে
বৃষ্টিতে, রোদ্দুরে জানতে পারি
প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা রাত্রি, প্রত্যেকটা মুহূর্ত
খেতে খেতে জানতে পারি
আমরা মানুষ ছাড়া কিছু ছিলাম না
আমরা মানুষ ছাড়া কিছু নই
আমরা মানুষ ছাড়া কিছু থাকবোও না।।

মৃত ভাষার মুখে

রথীন দে

ধরুন, একটি বালিকা, বাড়ন্ত কিশোরী থেকে পূর্ণ যুবতী—উপরন্তু পোষাক, প্রসাধন আর অলংকরণে ঝকঝকে সুন্দরী, যার বুকের গভীরে ঝামরানো মেঘের যে অব্যক্ত বেদনা গুমরে ওঠে নীরবে, তাকে যদি সৃষ্টির মূল স্রোতের সঙ্গে, অর্থাৎ উপলব্ধির নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিতে না পারি—তখন? এই সৃষ্টিশীল চিন্তাটা কখনও পাক খায় নি আমার উর্বর মস্তিষ্কে। যদিও আমি এবং আমার ভাষাবোধ একই মাত্রায় ছুটে বেড়াই। রেসের ঘোড়ার মতন দুরন্ত বেগে। সময়ের এই দ্রুত গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেদিন স্টেশন চত্বরে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে দেখি ইঞ্জিনের ছুটন্ত চাকা প্ল্যাটফরম গ্রাস করতে উদ্যত, মুহূর্তে প্রায় চলন্ত রিকশা থেকে একটা লং জাম্প। রোগা লিকলিকে একটা ডানহাত ছুটতে থাকে আমার অবাধ্য গতির পিছনে।

বিকেলে—বিকেলে—প্রতিশ্রুতি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমি তখন ওভার ব্রিজের উপর দিয়ে রকেট-ডানায় উড়তে থাকি। সঙ্গের ভাষাবন্দি ব্রীফ কেসটাও। ওর ডান হাতটা কেটে বেরিয়ে যায়। আমার ডান হাতটা কিন্তু আকশির মতন বেড়ে যায়। অবশেষে—ভো কাট্টা! শেষ বগির শেষ হাতলটার ডাহা বেইমানি—হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে পড়ি। চোখের সামনে সিগন্যালের লাল আলোটা শুধু জ্বলতে থাকে, রিকশা চালকের চোখের মতন। আমার আক্ষেপ বাড়িয়ে দিয়ে গাড়িটা ক্রমে দ্রুত মিলিয়ে যায়। দূরে, বহুদূরে—এক রহস্যময় বিন্দুতে।

রাগে ক্ষোভে দুঃখে একেবারে ফেটে পড়ার উপক্রম—ঠাণ্ডা মাথায় একটু সতর্কতার সঙ্গে স্পীড বাড়ালে এমন কী ক্ষতি হত? মাঝে মাঝে যা বেসামাল টাল খাচ্ছিল। তবুও নিজের স্বার্থে ওকে একটু উস্‌কে দিয়েছিলাম আর কি—সঙ্গে সঙ্গে পড়বি তো পড় ওই বুড়ো লোকটার ঘাড়ে।

হতচ্ছাড়া। সঙ্গে সঙ্গে লাঠির এক ঘা। বালক হাতজোড় করে কিছু বলতে যাবার ফাঁকে ফের উত্তেজিত লাঠির ফোঁসফোঁসানি—দেব মাথা ফাটিয়ে—আবার চৈতন্য সাজা হচ্ছে!

কী হয়েছে দাদু? তুরন্ত বেড়ে উঠেছিল একরাশ মত্ত হাটুরে দরদ। আমি ত্রিশঙ্কু। এসব ক্ষেত্রে যা ভাবি আমরা, রিকশা থেকে নেমে গা ঢাকা দেওয়া।

পরমুহূর্তেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার চোখচোখি, বরং বলা ভাল শুভদৃষ্টি—ওঃ আপনি! ওই, ওই দেখুন—কেমন বিড়বিড় করছে—ন্যাকা। আপনি তো মশায় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক, কিছু বুঝতে পারছেন?

যাদের ভাষাই সৃষ্টি হয়নি, তাদের ভাষা বোঝার মতন ফালতু সময় আমার হাতে নেই। আমার ভেতরকার চাপা ক্ষোভের দমক এমনি বেদম হয়ে উঠেছিল।

বেটার চোখদুটো দেখেছেন? ভদ্রলোক নিজের লাল গোলকদুটো আরও রগরগে করে আমার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন—একেবারে বুনো শিমূল ফুল! মদ গাঁজা ছাই-ভস্মের দোকান দিন দিন বাড়ছে, এদিকে আমাদের নিরাপত্তা কমছে।

পাত্তা থাকলে তবে তো নিরাপত্তার প্রশ্ন। আসলে জনগণের ভালমন্দ রাজকোষের কারাগারে চিরকালই বন্দি।

ঠিক ঠিক। ভদ্রলোকের সমর্থন, উপরন্তু পরিচিত, তাই সহজ হয়েছিল পরিত্রাণ। কিন্তু—

২

কিন্তু ওই বিপত্তির জন্য আমার সার্বিকবোধ কতটা দায়ি? বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঝাউ গাছের ছায়া মাড়িয়ে রাস্তায় পা রাখি। তারপর বড় বড় পা ফেলে বড় রাস্তার মোড়ে এসে দেখি স্ট্যান্ড ফাঁকা—শুনশান ফাঁকা। অফিস টাইমে এই এক জ্বালা। রাস্তার ওপারে বিদ্যাসাগর ভাষাহীন মুখে বোবা পাথর। একদিকে আমার ঘড়ির কাঁটা দশটার লোকালটার কাছে আজ নির্ঘাৎ ভো-কাট্টা। এক কথায় সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের উপর প্রথম ক্লাসটা আজ গেল!

চোখের সামনে দূরের রিকশাগুলো যাত্রী নিয়ে অদৃশ্য কোন ট্রেনের চাকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। শাঁই শাঁই ক্রিং ক্রিং। কানের পর্দায় অসহ্য ডেসিবেল যন্ত্রণা। আমি অধীর এবং অস্থিরতার শিকারে পরিণত হলাম। মানসিক অবস্থার চাপে পায়ের স্নায়ুগুলো শির শির করে কাঁপতে লাগল। না, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরর্থক, বরং দু'পা এগিয়ে—

ওই তো গুমটির ও-পাশে একটা রিকশা—খালি। চালকই সিটে বসে ঝিমোচ্ছে। বাহবা, এরি নাম স্বাধীন পেশা, মর্জিমাফিক চলা। কাছে গিয়ে দেখি গুটিসুটি মারা। মুখটা সচল ট্যাক্সির অচল মিটার দেখানোর মতন লাল চাদরে মোড়া। আমি ঝোড়ে গলায় তেড়ে উঠলাম—এই, ওঠ ওঠ।

কোন সাড়া শব্দ নেই। বাধ্য হয়ে অবাধ্য হয়ে উঠল আমার কণ্ঠস্বর—এই, উঠছিস না কেন?

চোখের উপর থেকে চাদরটা এবার খসে পড়ল খানিকটা। এঁটেল চোখদুটো একটু খাবি খেল। হাঁ করে ঈষৎ তাকিয়ে মাথা নাড়ল। পরমুহূর্তে মুখটা আবার চাদরের তলায় বেমালুম চাপা পড়ে গেল।

অসহ্য। অথচ মুখটা আমার অপরিচিত নয়। নামটা কী যেন বলেছিল একদিন। ভুলে গেছি। বয়েস কম। পেশায় নবাগত। ওর নির্ঝঞ্ঝাট ব্যবহারের জন্য সবার চাহিদাই একটু বেশি। ওঠার পরিবর্তে বরং নড়ে চড়ে একটু জম্পেস হল।

ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিকর। অথচ এই মুহূর্তে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া কোন গতি নেই। গলার ভেতর থেকে উদ্গার বেরিয়ে এল—হ্যাঁরে, আয়েস করার আর সময় পেলিনে। এই লোকালটা না ধরতে পারলে আমার যে ভীষণ ক্ষতি হবে। নেমে আয়।

আমার চাপা ক্ষোভের আদুরে ধমক সামলানো ওর পক্ষে বোধকরি সম্ভব হল না। লোকটা এইবার একটু আড়মোড়া ভাঙল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেমে এল। মুখে গোঙানির মতন একটা শব্দও তুললো। পলকে এক লাফ—দমে চালা।

এইভাবে চালাতেই গিয়েই—

৩

সন্ধের পর স্টেশনে নেমে ওই রিকশাচালকের খোঁজ করা আমার উচিত ছিল, কিন্তু পরদিন সকালেও ওর খোঁজ করা আর সম্ভবপর হল না। ব্যস্ত ছিলাম একটা সংবর্ধনা সভার জবাব তৈরি করতে। বিকেলে নিরক্ষর সমিতির পক্ষ থেকে আমাকে সংবর্ধনা দেবে বিভিন্ন ভাষাতত্ত্বে আমার অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি জানিয়ে।

সুতরাং দুপুর গড়িয়ে পড়ার আগেই ঝাউগাছের মহাসঙ্গীত সঙ্গে নিয়ে দুলকি চালে হাঁটতে থাকি। আশ্চর্য, আজও স্ট্যাণ্ড ফাঁকা। একটাও রিকশা নেই রাস্তায়। গতকালের অবাঞ্ছিত ঘটনাটা মাথার ভেতর অকস্মাৎ চিড়িক মেরে উঠল। প্রতি কোষে একটা যন্ত্রণার স্রোত। একমাত্র ঘড়িই আমায় আশ্বস্ত করল—বাড়তি সময় যেটুকু পুঁজি আছে, ধীরে সুস্থে হেঁটে গেলেও—পরপর দুটো গাড়ি। কিন্তু গতকালের সেই রিকশাচালকই বা কোথায়? কাল ধরে বেঁধে যে-ভাবে নিয়ে গিয়ে নাকাল হয়েছি। কিন্তু ভাড়াটা মিটিয়ে দেওয়া খুবই জরুরি। পথে ঘাটে বেমক্কা তাগাদার শিকার হতে কতক্ষণ। দেখাই যাক—

ওই তো চা-গুমটির ফাঁকা বেঞ্চিতে পুরানো সেই রিকশাচালক। ঠোঁটে লাল সুতোর বিড়ি। ধোঁয়াটে দৃষ্টি। মাথায় কাঁচা পাকা চুলের ঝুরি। আপাত

দৃষ্টিতে লোকটাকে গোবেচারা মনে হতে পারে, কিন্তু ক'দিন আগে বস্তির সামনে একজন মাঝ বয়েসি লোকের সঙ্গে সেকী তুমুল ঝগড়া! ফাঁকফোঁকরে অকথ্য ভাষার পথ্যি। আমি তখন রিকশার উপর ঠায় বসা। উসখুস করতে করতে একসময়—চলো ভাই, চলো। তাছাড়া পথেঘাটে এমন সব নোংরা ভাষা—

ওঁচা বস্তির মুখে খুঁজছেন তোফা ভাষা? ঘাড় বাঁকিয়ে একেবারে তেড়েফুঁড়ে জবাব—ওসব সাবান-ঘষা বুলি আমরা ঢের শুনেছি। ভোটের সময় বাবুরা এসে মুখে খাসা খাসা ভাষা ঠেসে দেয়, তারপর মুখে ভাষা দিতে কেউ আসে না।

বাহবা, একজন ভাষাবিদকে ভাষা শিক্ষার পাঠ নিতে হচ্ছে, তাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন হতমান হয়েছিলাম যতটা, তার চেয়েও বেশি বিস্মিত, বিপন্ন। ঘটনাটা মনে পড়তেই কেমন চুপসে গেলাম। তবুও নিরুপায় জিজ্ঞাসা—তোমার রিকশা কোথায়?

আজ চলবেনি, বাবু। নির্বিকার জবাব।

কেন?

বলে কী লাভ আপনাকে?

লোকটা তো বড্ড বেদাঁড়া। তবুও ওর কঠিন মন স্পর্শ করার জন্য বললাম—লোকসান হলে না হয় পুষিয়ে দেব।

আপনারা পুষে রাখেন আমাদের, পুষিয়ে দেন না। আমাদের হেক্‌টারিকে চেনেন?

কে?

জগাই গো বাবু, জগাই। ওর রিকশাটা চেনেন আর মানুষটাকে চেনেন না? কাল সকালেই আপনাকে ইস্টিশনে দেখলুম ওরই রিকশায়।

তো।

ফিরতি পথে রিকশা থেকে পড়ে যায়।

চমৎকার! জগাই-এর সঙ্গে মাধাই—নইলে রিকশাচালক পড়ে যায় রিকশা থেকে। সমবেদনার পরিবর্তে মুখ ফসকে বেরিয়ে এল—যা গাঁজা ভাং খেত! চোখ তুলে তাকাতেই পারছিল না কাল। তখনই বুঝেছিলাম—

আমাদের কথা বুঝবেন আপনারা! সবাই তো আপন আপন আপন ব্যস্ত মানুষ। ও গাঁজা ভাং কেন খাবে?

তবে চুল্‌লু—

এ সময় বাজে বকে খামকা কেন মেজাজ বিগড়াচ্ছেন বাবু! ও বিড়ি পর্যন্ত খেতনি।

ওর কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় আমি বিব্রত হয়ে বললাম—খুব ভাল কথা।

এখন আমাকে একটু পৌঁছে দেরে? ভাড়াটা না হয় বেশি দেব'খন।

ন্যায্য ভাড়া দেবার সময় হয় না, এখন দেখাচ্ছেন বেশি ভাড়ার লোভ। রিকশা চলবেনি আজ, সাফ কথা। হেঁটে যান বাবু।

তা না হয় গেলাম। কিন্তু—

'কিন্তু' শুনিয়ে কী লাভ আপনাকে?

আহা, চটে যাচ্ছ কেন? আমাকে শুনিয়ে যদি লোকসান হয়—

হবে আবার কী? এক ঝটকায় আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—হয়ে গেছে! কত নেখাপড়া জানেন, আর এইটুকুও বুঝতে পারেননি বাবু? ওই যে কীসব কাল-জ্বর হচ্ছে আজকাল, ওতেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল—আজ সকালে বেচারা মরে গেল গো!

ম-রে গে-ল!! আমার অস্ফুট আর্তকণ্ঠ ছিনিয়ে নিয়ে মাথার উপর চিৎকার করে উঠল একটা গাঙ চিল। ভাষাহীন আকাশের নীল বুক চিরে।

হে গো বাবু। একটা দীর্ঘশ্বাস—যেন টায়ার ফাটার শব্দ। তারপর বললে—গঙ্গার ধারে ওই ধড় চটকলটা বন্ধ হয়ে যেতে জগাইকে আমিই রিকশা ধরালাম। আমাদের মালিকটা বড় হারামি, ক'টা টাকা ধার দিলে, আজ কি পথে বেরুত।

ডাক্তার দেখায় নি?

অত পয়সা কোথায়? হাসপাতালেও সিট নেই—একেবারে বিনে চিকিচ্ছেয়—বৌ বেটাবেটি সব এতটুকুন—

বলতে বলতে ওর গলায় যেন সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ল। সব কথা আমার কানেও গেল না। শুধু ওই অসহায় দীর্ঘশ্বাসের ফোঁসানি অথই করে তুলল শুনশান দুপুরের পোড়া বাতাস। এ যেন আদিম যুগের অনাবিষ্কৃত কোন শিলালিপির ভগ্নাংশ, যার সামনে দাঁড়িয়ে আমি বিভ্রান্ত এবং বিমূর্ত। এক সময় পিছন ফিরে মনে হল, এক্ষুনি কাছেপিঠে কোন টেলিফোন বুথে যাওয়া একান্ত জরুরি।

৪

আঙুলের ডগা বিচ্ছিরিভাবে কলিং বেলের বোতাম চেপে ধরল। ভেতর থেকে ভেসে এল চাপা ঝংকার—কে, এই ভরদুপুরে আবার—

'জ্বালাতে এল' কথাটা নেহাত ভদ্রতার খাতিরে জিভের ডগায় আটকে রেখে উঠে এল স্ত্রী। সারা মুখে কাঁচা ঘুমের বিরক্তি লাট খাচ্ছে। আমাকে দেখে তো অবাক—তুমি! কিছু ফেলে গেছ?

আমি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি ফেলে। আমার হাবভাব স্ত্রীর কাছে বোধকরি অস্বাভাবিক ঠেকল। বললে—কী হয়েছে, শরীর

খারাপ? ভেতরে এস।

ঘরে ঢুকে দরজার একপাশে রাখা ঠাকুর্দার আমলের আবলুস কাঠের চেয়ারটাতেই বসে পড়লাম। সমস্ত ঘটনার সঙ্গে আমার সার্বিক মানসিক অবস্থার কৌণিক বিন্দুটা তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম। সংক্ষেপে এবং খুব আন্তরিকতার সঙ্গে। স্ত্রীর কপালে নানারকম ভাঁজ উলটপালট খেল—ভাড়াটা দিতে পারনি বলেই কি তোমার এত দুঃখ?

ঠিক তা নয়, বরং তার চেয়েও—

বড়ো কিছু? আমার অসমাপ্ত ভাবনার জট ছিনিয়ে নিয়ে স্ত্রী অচেনা গলায় বললে—সামান্য একটা রিকশাওয়ালা, তার মৃত্যুর জন্য তুমি এতটা বিচলিত হচ্ছ কেন? অবশ্য তুমি যদি একজন ডাক্তার হতে—

তাহলে সমস্যাটা কিছুটা হাল্কা করে দিতে পারত আমার ভেতরকার যন্ত্রণা। এইটুকু যা।

তবে?

ব্যাপারটা মনে হচ্ছে তার চেয়েও গভীর—একটা দুঃস্বপ্নের মতন আমার বুকে ছোবল মারছে।

স্ত্রী আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। মনে হল, দু'জনের মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে এক ভাষাহীন দুর্বোধ্যতার শূন্যতা। তা কি নিরর্থক তর্কবিতর্ক দিয়ে ভরাট করা যায়? সুতরাং একটা সাহচার্যহীন দীনতার হাহাকার দেখা দিল আমার সূক্ষ্ম অনুভূতির জগতে। অথচ সবার ভাষা আমি জানি এবং বুঝি। আমার এই অহংবোধ শাখা প্রশাখা নিয়ে শো শো শব্দে বেড়ে উঠেছে লনের ওই ঝাউ গাছটার মতন মাথা উঁচু করে—সমুদ্র থেকে দূরে। কিন্তু সেই রিকশাচালক, আক্ষরিক অর্থেও যার কাছে আমি এখন ঋণী। সে তো মাটির কোন পুতুল ছিল না—তার সেই বাকশক্তিহীন মলিন মুখের ভাষাতীত ভাষা, যার ভেতর অসহায় মানবাত্মা নীরবে মুখ লুকিয়ে কাঁদে। তা কি আমি ব্যস্ততাহীন আন্তরিকতার সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্যও উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, না কোন দিন চেয়েছিলাম, তাহলে হয়তো—

এই 'হয়তো' ভাবনাটা আমাকে একেবারে এলোমেলা করে দিল। শুরু হল টালমাটাল পদচারণা। মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। রাশি রাশি ভাষাতত্ত্বের বই উঁকিঝুঁকি মারে কাঁচবন্দির আড়ালে। নিজের গায় চিমটি কাটি। নখের দাগ নীলাভ করে তোলে চামড়ার খোলস। কখনো বা শূন্যে দৃষ্টি রাখি খোলা জানালার কাছে। অজানা আকাশ কোণে একদঙ্গল বুনো মোষ তেড়েফুঁড়ে আসে। যে ছুঁচলো ঝাউ গাছটা দিনভর আকাশ ফুঁড়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, ওটা এখন ঝড়ের আশংকায় স্তব্ধ—ভীত। প্রকৃতপক্ষে ওর গোড়টাই ক্ষয়ে গেছে ভেতর থেকে। বহুদিনের অযত্ন আর অবহেলায়।

নীল আকাশের আঙিনায় দুপুর দাপানো সেই গাঙ চিলটাও উধাও। আমি বিধ্বস্ত এবং ক্লান্ত দেহটা সোফার উপর ছেড়ে দিলাম। একটা কাক জানালার পাল্লায় এসে ঝপ্ করে বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে বার কয়েক তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করল আমাকে। তারপর কর্কশ স্বরে ডাকতে ডাকতে ওটা ঝড়ের ডানায় মিলিয়ে গেল ঝাউ গাছের আড়ালে। আমার ভেতর একটা অজানা ভয় ঝামরে উঠল সহসা। জানালাটা বন্ধ করে দিলাম সশব্দে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই দামাল আকাশ পুরোপুরি বেসামাল। অকস্মাৎ কড়কড় মড়মড়— কেঁপে উঠল ঘরদোর। আমি অন্ধকার বালিতে হাতমুখ গুঁজে উটের মতন খানিকক্ষণ পড়ে রইলাম।

৫

অকস্মাৎ হর্ন বেজে উঠল বাইরে। পাড়া কাঁপিয়ে। ঠিক আমার বাড়ির সামনে। চমকে উঠে জানালা ফাঁক করি। কালো গাড়ি, আমারই গেটে। ছিটকিনি খুলতেই আমি অপ্রস্তুত, হতবাক—সমিতির লোকেরা এভাবে বাড়ি এসে উপস্থিত হবেন ভাবতেই পারছি না। ওঁদের মধ্যে একজনের হাতে গরদের চাদর আর রজনীগন্ধার টাউস মালা।

বিপন্ন বিস্ময়ে তখন সহসা নজরে পড়ল রাস্তায় অসংখ্য রিকশার মৌন মিছিল। একটা লজ্জিত চাহনি তুলে আমি সকরুণ প্রার্থনায় বললাম—আমি আন্তরিক দুঃখিত, মাফ করবেন। ওই মালা আর চাদরটা এখনই আমার হাতে তুলে দিতে কোন আপত্তি নেই তো?

কয়েক জোড়া বিস্মিত চোখের উপর দিয়ে গেট পেরিয়ে আমি নীরবে নেমে এলাম রাস্তায়। শায়িত ঝাউ গাছটার পাশে। কিছুক্ষণ আগেই ওটা আমার বাগান উজাড় করে পড়ে গেছে পাঁচিলের ভিত ভেঙে, মুখ থুবড়ে। দু'পা এগিয়ে যাবার মুখেই আচমকা হোঁচট—পায় পায় জড়িয়ে গেছে একরাশ ছেঁড়াখোঁড়া তারের বিচ্ছিন্নতা। আমার ভেতর থেকে একটা শক্-লাগা মৃত্যু-যন্ত্রণা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মিছিলের ভেতর থেকে একটা লম্বা হাত আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল সবার মাঝখানে। আমার প্রিয় মৃত ভাষার কাছাকাছি। পরমুহূর্তেই একটা বিষম-লাগা চোখাচোখি— বা-বু, আপনি? ঐ যা, মালা চাদর সব নোংরা হয়ে গেল যে। চোট লাগেনি তো?

চোট? আশ্চর্য! এতো দুপুরের সেই বুড়ো রিকশাচালক। মুখভর্তি সাদা দাড়ি। খোঁচা খোঁচা। ওরই ফাঁকে জমে উঠেছে সন্ধের সজল বিষণ্ণতা। অকস্মাৎ ভুরু নাচিয়ে বললে—কোথায় যাচ্ছেন গো, বাবু?

প্রশ্নটা সে এমন গোমড়ানোভাবে এবং এমন ধারালো দৃষ্টি ফেলে করল, উত্তরটা ওর গলার ভেতর যেন খাবি খেতে লাগল। আমাকে নিশ্চুপ রেখে

দিয়ে পরমুহূর্তে লোকটা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতন ঈষৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বললে—বুঝেছি, কিন্তু কী হবে এ-সব দিয়ে? ওর মরা মুখে কথা ফুটিয়ে তুলতে পারবেন তো বাবু?

আমি থ! এই ধারালো কথার কোন কুণ্ঠাহীন জবাব আমার জানা নেই। লোকটাকে আগে যে-চোখেই দেখতাম না কেন, এখন আর সামান্য মনে হচ্ছে না। বরং মনে হল, একটা অসামান্য চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে আমার কেতাবি ভাষাবোধের গভীরে। তাও তীব্র শ্লেষের সঙ্গে। আমার অধিকারের প্রশ্নটা এখানে এসে গেলেও, গতকালের দুঃখজনক ঘটনাটা এখন স্পষ্টই মনে পড়ে গেল—অস্থির মাথায় মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল—'যাদের ভাষাই সৃষ্টি হয়নি—' কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য হলেও, এখন মনে হচ্ছে ভয়ংকর সত্য।

একজন তুখোড় ভাষাবিদ জীবনে এই প্রথম তার সমস্ত জাগতিক ভাষা মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে ফেলল। ধীরে ধীরে একটা নতুন বোধিবৃক্ষে পরিণত হয়ে গেল।

কামরাঙা

রামতনু দত্ত

মুলো খেলে মুলোর ঢেঁকুর ওঠে কিন্তু তির্যকের ওঠে না। তির্যক শুধু নির্নিমেষ নয়নে সব দিক ও সব কিছু লক্ষ্য করতে থাকে। তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন কিছু পান করছে। তির্যকের কথায়, 'আধ গেলাস খেলেই যদি আমার নেশা হয় তাহলে পানীয়র পরিমাণ কতটা এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে।' আর পাঁচজনের মত নয় তির্যক, হয়তো অন্যদের মতো হতে চায়নি সে। অথবা দশচক্রে ভগবান ভূত হয়, সঙ্গদোষে সৎসঙ্গে মানুষ নাকি কত কী হয়ে যেতে পারে। এরকম ইচ্ছা অনিচ্ছায়, সংসারের টানাপোড়েনে, কত হাতি ঘোড়া গেল তল আর আমাদের তির্যক চামচিকে হয়ে হাতিকে লাথি মারতে লাগল।

তা তির্যক কাচের গোলঘরের ভিতর থেকে বাইরের জগৎকে দেখে। অসুবিধে হলে বাইরে এসে কখনোসখনো গোলকাচের ঘরটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর মন গেলে অকারণ হাঁটতে থাকে, কখন কোন রাস্তায় বলা মুস্কিল। তির্যক হাঁটে কিন্তু ঘাঁটে না। ডাঁটে এগোয় তির্যক, পিছলে পড়লে বলে জুতোর দোষ।

তির্যকের মতে, এই সংসার একটি ভুজুং ভাজাং দেওয়া জোড়াতালি, কত গুজো দিয়ে যে চলছে। সকলেই হেরে যাচ্ছে অথচ স্বীকার করছে না। আড়াল খুঁজছে, পেয়েও যাচ্ছে। মানানসই ইমেজের আড়ালে, মুখোসের ঘোমটায়, রঙচঙে ঠেকা দেওয়া কাজচলা করেকর্মে খাওয়া সিভিলাইজ মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে সে খুব একটা ভরসা পায় না। তারপর নিজের দিকে তাকায়। খুব একটা পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে যন্ত্রণা অনুভব করে। অথচ সে তো ভিন্ন হতে চায়, তার স্বপ্নই তো সবার মত না হওয়া!

হেরে যাওয়ার কষ্টে তার যেমন ভিতর থেকে কান্না ডুগরে বেরিয়ে আসে আবার তেমনই হাসি পায়। কারণ সত্যই কি তির্যক কিছু হতে চেয়েছিল। স্বপ্ন অনেকেই দেখে। অল্প বয়সে, যৌবনে রোমান্স, রোমান্টিসিজম, অ্যাডভেণ্টারিজম্ থাকবে তা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যৌবন পার হয়ে গেলেও কী তা থাকবে? ফিরে দেখা? ফিরতেই হয়। বার বার ফিরে ফিরে নিজেকে দেখা। দেখলেই চেনা যাবে, জানা যাবে, বোঝা যাবে এমন নয়, তবু দেখা।

তির্যক বন্ধুদের কথা ভাবে। সফল বন্ধু, অসফল বন্ধু, গোঁজামিল দেওয়া

ঠেকঠুক দেওয়া ছাপোষা ও সুখী মধ্যবিত্ত বন্ধু, পিছলে যাওয়া বন্ধু, হারিয়ে যাওয়া বন্ধু, কেটে পড়া বন্ধু, বিপ্লবী বন্ধু ও আত্মহত্যার পথে যেসব বন্ধু। সব মুখগুলোই ছুটে এসে তির্যকের গালে, কপালে, ঠোঁটে ঠোক্কর খেতে থাকে। অভিভূত হয়ে যায় তির্যক। কারর প্রতিই তো তার রাগ নেই। এদের সক্কলকে তার সবচেয়ে কাছের মানুষ মনে হয়। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। তির্যকের চোখের সামনে পরীর ডানা ও সুন্দর ঠোঁটের বাঁকানো হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে যায়। তির্যক পিউপা ভেঙে বেরিয়ে আসে। আর অস্তিত্ব রক্ষা করে, যারা পারে না, তাদের দিকে করুণার চোখে তাকায়। সকলের মধ্যেই ভুলত্রুটি খোঁজে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় ব্যর্থতা একটি অসুখ। চাবকে সোজা করে দেওয়া উচিত। এত ঘুম ভালো নয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখা বরদাস্ত করে না প্রজাপতি তির্যক।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, পিছনের আয়নায়, কল্পনাকে দেখে। কল্পনা হাসে ও ইঙ্গিত করে, হয়তো কিছু প্রত্যাশাও করে। তির্যককে নিয়ে কল্পনার কত গর্ব। তির্যক বোঝে কিন্তু যা বোঝে না বা বুঝতে চায় না তা হল কল্পনার ছক, প্ল্যান ও ভাবী অগ্রগতি।

ওসব ভেবে কি হবে। নিজেকে পুরুষমানুষ ভেবে খুশি হয় ও খুশি থাকে। কোনো দুর্বলতাকেই সে স্থান দিতে চায় না, একমাত্র ব্যতিক্রম কল্পনা।

প্রজাপতি-জীবনে তির্যককে ভীষণ খুশি, সুখী সুখী মনে হয়। তবে তির্যকের বৈশিষ্ট্য হল সে বেশীক্ষণ প্রজাপতি থাকে না। বার বার ডিম ও লার্ভার পথে সে পিউপার মধ্যে ঢোকে তারপর টুক করে যখন তখন প্রজাপতির আকারে বেরিয়ে আসে। তখন তার নাকি বিশ্বরূপ দর্শন হয়, তাই সে এমন করে।

টেলিফোনের ওপার থেকে যে ময়ূরকণ্ঠীর গলা ভেসে আসছে তাকে সে চিনতে পারছে না কিছুতেই। অথচ ওদিকের দাবী সে তার বহু পরিচিতা। এমনকি তার সঙ্গে সে এক বিছানায় শুয়েওছে। ছিঃ ছিঃ! এসব কী হচ্ছে আজকাল টেলিফোনে, সে বুঝতে পারে না। ময়ূরকণ্ঠীর স্বর খুব অপরিচিত নয়, কিন্তু চেনা মুস্কিল এখন। ফোন নামিয়ে সে স্বস্তি অনুভব করে কিন্তু কেমন খিচকে যন্ত্রণা গলায় মাছের কাঁটা লাগার মত আটকে আছে।

তির্যক ভাবে এ ফোনের কথা সে কাউকে কি বলতে পারবে। সবাই সন্দেহ করবে। কল্পনাকে বলা তো তার কল্পিত ও সখের পৃথিবী ভেঙে চুর চুর হয়ে যাওয়া। হঠাৎ ভাবে সেকি তবে কল্পনাকে ভালোবাসে না, ভালবাসলে একথা নিশ্চয় বলতে পারতো। পরক্ষণেই সামলে নেয়। ভালবাসা তো দুদিনের। বাকী সময় খুব সাবধানে এক্সপার্ট ড্রাইভারের মত গাড়ি চালানো।

তির্যক এ্যাটাচি হাতে রাজপথে নেমে আসে আর ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। যদিও সে এখন কোথায় যাবে ঠিক করেনি। আসলে সিদ্ধান্তটা সে ট্যাক্সির উপরেই ছেড়ে দিতে চায়। কোন ট্যাক্সি কোন দিকে কতদূর যাবে তার উপর।

রাত হয়েছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে সে পা বাড়িয়েছে রাস্তায়। একটু এগোতেই একটু অন্ধকার অন্ধকার। তির্যক দ্যাখে গলা টিপে যাকে মেরে ফেলা হচ্ছে সে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহপাঠী বন্ধু প্রিয়জন।

তির্যক দেরী করে না একপলকও। সে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে তেমনই শান্ত ও অবিচলভাবে হাঁটতে থাকে। কারা খুন করছে সে বুঝতে পারে না। কিন্তু যাকে খুন করছে, কে করছে—এসব তির্যকের মাথায় জট পাকিয়ে যায়। অন্ধকারে ওরা ওকে দেখতে পাবে না নিশ্চিত হয়েই সে নিশ্চিন্ত মনে হাঁটছে। থানায় জানানোর কথা তার মনে হল কিন্তু পুলিস সম্পর্কিত ধারণায় তা ধোপে টিকল না। বাঁপাশের গলি দিয়ে সে অন্যদিকে চলে গেল।

বেল টিপে ফ্ল্যাটে ফিরে সে একটা আরাম কেদারায় ধপ করে বসে পড়ে। কল্পনার অনেকগুলো প্রশ্নেরই সে জবাব দেয় না। কল্পনা তাকে ঝাঁকিয়ে দেয়। তির্যক বলে তার ঘুম পাচ্ছে। পরক্ষণেই বলে না বমি পাচ্ছে। বাথরুমে যায়—ওয়াক ওয়াক করে কিন্তু বমি হয় না। তির্যক জামাকাপড় না ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

কল্পনা ব্যাপারটাকে ভালোভাবে না নিলেও এখন তার মনও তাকে ধৈর্য ধরতেই বলে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর তির্যক বলে ঃ 'কল্পনা, তোমার যখন সব স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে যাবে তখন তুমি কী করবে?'

'কী হয়েছে আগে বল্লে তবেই উত্তর দেবো।'

'হলে তো বলব। আসলে আমার যে কী হয়, আমি নিজেই বুঝি না। শরীর ও মন যখন চুক্তি করে জট পাকিয়ে দেয় তখনই ঝামেলা বাড়ে।'

কল্পনা যেন খুশি হয়। বলে, 'আমার শাড়ি কই? কথার দাম নেই, এমন হাজব্যাণ্ড নিয়ে কাররই মাথাব্যথা থাকে না।'

'তোমার শাড়ি আমি অফিসে ফেলে এসেছি। কাল পেয়ে যাবে। কল্পনা, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—তুমি নিজেকে কী সত্যিই সুন্দরী মনে করো?'

কল্পনা বলে, 'ঘুমোবে, না ঘুমের ট্যাবলেট দেবো। বাড়ি এসে থেকে উল্টোপাল্টা বকছ। আমি ঘুমোলাম। যা পার কর।'

কল্পনা ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু তির্যকের ঘুম আসে না। মনে হয় আজ আর আসবে না। তির্যক বারান্দায় পায়চারি করে, জল খায়, বাথরুমে যায়, চেয়ারে বসে—কিছুতেই স্বস্তি পায় না। নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়। আবার

সে কত অসহায় ও দুর্বল ভেবে ঠাণ্ডা মেরে যায়। মার্কারী ল্যাম্পের আলো পড়েছে রাস্তার উপরে আর চাঁদের আলো তার ঘরের বেড়ে ছড়াছড়ি। জ্যোৎস্নার সমুদ্রে কলার ভেলার মত ভাসছে কল্পনা। জ্যোৎস্নার ঢেউগুলি ফেনাসমেত আছড়ে পড়ছে কল্পনার পিঠের দিগন্তে।

তির্যকের মনে হয় সে ভুল করেছে এবং প্রতিদিনই ভুল করছে। প্রতিদিনই সে হেরে যাচ্ছে। তার পরাজয়ের কথা সে ছাড়া আর কেউ জানতে পারছে না। সেও কাউকে বলতে পারছে না। ফলে কষ্ট ও যন্ত্রণা লাউ গাছের মত লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে তার শরীর মনের চালে।

তির্যক বারান্দার ফাঁক দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখতে চায়। তার চোখ বড় বড় কংক্রিটের ফ্ল্যাটে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। কত টাকা হলে একজন মানুষ সুখী হবে সে বুঝতে পারে না। টাকার স্কেলে সবকিছু মাপা ঠিক নয়, সে জানে। কিন্তু টাকা উপার্জনের নেশা যে কী তা সেও টের পায়। প্রিয়জন টাকা দিয়ে অন্ধকার ভাঙতে গিয়েছিল। অথচ আধুনিক টাকার সোর্স তো ঐ অন্ধকার জগত। প্রিয়জনকে বুদ্ধিমান বলেই জানতো কিন্তু এখন কেমন বোকা মনে হয়। কিন্তু তির্যকের নিজেকেও চালাক ও পুরুষ বলে মনে হয় না কিছুতে। চাঁদের আলো তির্যকের চোখে মুখে সন্দেহের কালসিটে পড়িয়ে দিচ্ছে।

পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে তির্যক আর চাঁদের কলঙ্কগুলো ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কান্না পায়। মা বাবাকে মনে পড়ে। যোগফল শূন্য মনে হয় তার কাছে।

তির্যকের দুচোখ দিয়ে টস্ টস্ জলের ফোঁটা নামতে থাকে আর ফোঁপাতে থাকে সে।

ঘুম ভেঙে যায় কল্পনার। সে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়ায় আর দ্যাখে, তির্যক জ্যোৎস্নার চাঁদের দিকে তাকিয়ে ঝর ঝর করে কাঁদছে।

কল্পনা তির্যকের মুখটা বুকের মধ্যে টেনে নেয়, আর বলে ঃ 'কী হয়েছে তোমার, বল শিগ্‌গীর? আমি তোমাকে পথ দেখাবো।'

তির্যক জলভরা চোখে কল্পনার দিকে তাকায়। কল্পনাকে তার নক্ষত্রখচিত আকাশের চেয়েও অনেক বেশী বিস্ময়কর মনে হয়।

সে বলে ঃ 'আমি হারছি না জিতছি, বুঝে উঠতে পারছি না কল্পনা!'

কল্পনা তির্যকের চুলে তার দুহাতের দশ আঙুল সমান নৈপুণ্যে খেলাতে খেলাতে বলে ঃ 'যে হারে সেই জেতে, আর যে জেতে সে হারে।'

ফাতিহা

প্রেমচন্দ

সরকারী অনাথ আশ্রম থেকে বেরিয়ে আমি সোজা ভর্তি হই ফৌজে। আমার দেহ ছিল হৃষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ। সাধারণ মানুষের চেয়ে আমার হাত-পা অপেক্ষাকৃত লম্বা ও স্নায়ুযুক্ত ছিল। আমার উচ্চতা ছিল ছয় ফিট নয় ইঞ্চি। পল্টনে আমি বিখ্যাত ছিলাম 'দেব' নামে। যখন থেকে ফৌজে ভর্তি হলাম, তখন থেকে আমার ভাগ্য পালটি খেতে শুরু করে এবং আমার হাতে এমন কিছু কাজ হয়েছিল যাতে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আমার আয়ও বেড়ে যায়। পল্টনের প্রতিটি জওয়ান আমাকে চিনত। আমার ওপর মেজর সর্দার হিম্মত সিংহের অত্যন্ত কৃপা ছিল, কারণ আমি একবার তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলাম। এছাড়াও কেন জানিনা তাঁকে দেখে আমার হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সঞ্চার হতো। আমার মনে হতো ইনি আমার পূজনীয় এবং সর্দার সাহেবের ব্যবহারও আমার প্রতি স্নেহ ও মিত্রতাপূর্ণ ছিল।

আমার নিজের মাতাপিতার খোঁজ নেই আর না আছে তাদের কোন স্মৃতি। কখনও-কখনও যখন এই প্রশ্ন নিয়ে বিচার করি, তো কিছু ধোঁয়াটে দৃশ্য দেখতে পাই। বড়-বড় পাহাড়ের মধ্যে একটি পরিবার, একজন স্ত্রীর মুখ, হয়তো ইনিই আমার মা ছিলেন। পাহাড়ের মধ্যেই তো হয়েছিল আমার পালনপোষণ। পেশোয়া থেকে আশি মাইল পূর্বে আছে একটি গ্রাম, যার নাম কুলাহা, সেখানেই আছে একটি সরকারী অনাথ আশ্রম। এখানেই আমি বড় হয়েছি। এখান থেকে বেরিয়ে চলে গেছি সোজা ফৌজে। হিমালয়ের জলবায়ুতে নির্মিত আমার দেহ, এবং আমি তেমনি দীর্ঘাকৃতি ও বর্বর, যেমন সীমান্তের বাসিন্দা—আফ্রিদি, গিলজই, মহসুদী ইত্যাদি পাহাড়ি মানুষ হয়ে থাকে, যদি তাদের এবং আমার জীবনে কিছু তফাৎ থাকে, তো তা সভ্যতার। আমি একটু-আধটু লেখাপড়া জানি কথাবার্তা, আদব-কায়দা জানি। ছোট বড়র তফাৎ করতে পারি, কিন্তু আমার আকৃতি তেমনি, যেমন কোন সরহদ্দী পুরুষের হওয়া সম্ভব।

কখনও-কখনও আমার মনে এই ইচ্ছা জোরালো হয় যে স্বাধীনভাবে পাহাড়ে ঘুরিফিরি; কিন্তু জীবিকার প্রশ্ন আমার ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখত। সেই শুষ্ক দেশে খাবার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। ওখানকার মানুষ একটি রুটির জন্য মানুষ খুন করত, একটি বস্ত্রের জন্য মানুষের লাশ কেটেকুটে ফেলে

দিত, আর একটি বন্দুকের জন্য সরকারী ফৌজে হানা দিত। এর অতিরিক্ত ঐ জংলি জাতির প্রতিটি মানুষ আমাকে জানতো এবং আমার রক্তের পিয়াসী ছিল। যদি ওরা আমাকে পেতো, তবে নিশ্চয়ই আমার চিহ্ন দুনিয়া থেকে মুছে যেতো। না জানি কত আফ্রিদি ও গিলজাইকে আমি মেরেছিলাম; কতজনকে ধরে-বেঁধে সরকারী জেলে পুরে দিয়েছিলাম, আর না জানি ওদের কত গ্রামকে জ্বালিয়ে খাক্ করে দিয়েছিলাম। আমিও খুব সতর্ক থাকতাম এবং যতক্ষণ পারতাম এক জায়গায় এক সপ্তাহের বেশি থাকতাম না।

২

একদিন আমি মেজর সর্দার হিম্মৎ সিংহের ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। তখন বেলা দুটো। ইদানীং ছুটির মতো চলছিল; কারণ এখন সবেমাত্র কয়েকটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এক্ষুণি ওদের তরফে কোন আশঙ্কা ছিল না। আমরা নিশ্চিত হয়ে আড্ডা ও হাসিখুশিতে দিন কাটাচ্ছিলাম। বসে-বসে মন খারাপ লাগছিল; শুধু মন ভালো করার জন্য সর্দার সাহেবের নিকটে চললাম; কিন্তু রাস্তায় একটি দুর্ঘটনা ঘটল। একজন বৃদ্ধ আফ্রিদি, যে এখনও একজন হিন্দুস্থানী জওয়ানের মুণ্ডু গুঁড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, সে একজন ফৌজী জওয়ানের সঙ্গে ভিড়েছিল। দেখতে-দেখতে সে নিজের কোমর থেকে একখানা ধারালো ছোরা বার করল এবং তার বুকে ঢুকিয়ে দিল। সেই জওয়ানের কাছে একটি কার্তুজওলা বন্দুক ছিল, কেবল সেটার জন্যই এত লড়াই। পলক ফেলতেই ফৌজি জওয়ানটির সব শেষ হয়ে গেল এবং বন্দুক নিয়ে পালালো। আমি তার পিছনেই দৌড়ালাম; কিন্তু সে দৌড়ে এত এগিয়ে ছিল যে কথায়-কথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! আমিও বেপরোয়াভাবে তার পিছু নিয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত মোড়ে পৌছুতে পৌছুতে তার ও আমার মধ্যে কুড়ি হাত দূরত্ব রয়ে গেল। সে পিছন ফিরে দেখল, আমি একলা তার পিছু নিয়েছিলাম। সে আমার দিকে বন্দুক তাক্ করল, আমি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং বন্দুকের গুলি আমার সামনের পাথরে লাগল। সে ভাবল আমি গুলির শিকার হয়েছি। সে ধীরে-ধীরে সতর্ক পায়ে আমার দিকে এগোল। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। যখন সে আমার একেবারে কাছে চলে এলো, তখন বাঘের মতো লাফ দিয়ে আমি তার ঘাড় ধরে মাটিতে ফেলে ছোরা বার করে বুকে ঢুকিয়ে দিলাম। আফ্রিদির জীবনলীলা সমাপ্ত হয়ে গেল। এই সময় আমার পল্টনের কয়েকজন এসে পৌছুল। চারদিক থেকে সকলে আমার প্রশংসা করতে লাগল। এতক্ষণ আমি নিজের মধ্যে ছিলাম না, কিন্তু এখন আমার শোধবোধ ফিরে এলো, কেন জানিনা কত আফ্রিদিকে মেরেছি কিন্তু কখনও আমার অন্তর এত ঘাবড়ায়নি। আমি মাটিতে বসে পড়লাম এবং বৃদ্ধের দিকে দেখতে লাগলাম। পল্টনের

জওয়ানরা পৌঁছে গেল এবং আহত জেনে অনেক প্রশ্ন করতে লাগল। আমি ধীরে-ধীরে উঠলাম এবং চুপচাপ শহরের দিকে চললাম। সেপাইরা আমার পিছন-পিছন সেই বৃদ্ধের লাশ টানতে টানতে চলল। শহরবাসীগণ আমার জয়-জয়কার করছিল। আমি চুপচাপ মেজর সর্দার হিম্মৎ সিংহের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

সেইসময় সর্দার সাহেব নিজের খাস কামরায় বসে কিছু লিখছিলেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কি, সেই আফ্রিদিকে মেরে এসেছ?

আমি বসতে বসতে বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ; কিন্তু সর্দার সাহেব, না-জানি কেন আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গেছি।

সর্দার সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন—আসাদ খাঁ আর ভয়! এই দুটি এক জায়গায় হওয়া মুশকিল।

আমি উঠতে উঠতে বললাম—সর্দার সাহেব, এখানে ভালো লাগছে না, উঠে বারান্দায় বসুন; জানি না কেন আমার মন ঘাবড়ে যাচ্ছে।

সর্দার সাহেব উঠে আমার কাছে এলেন এবং স্নেহভরে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—আসাদ, তুমি দৌড়তে দৌড়তে হাঁপিয়ে গেছ, আর কিছু না। আচ্ছা চলো, বারান্দায় বসি। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া তোমাকে তাজা করবে।

সর্দার সাহেব ও আমি; দুজনে বারান্দায় গিয়ে চেয়ারে বসলাম। শহরের চৌমাথায় সেই বৃদ্ধের লাশ রাখা ছিল এবং তার চারদিকে ভিড়। বারান্দায় যখন আমাকে বসে থাকতে দেখল, তো লোকেরা আমার দিকে ইশারা করতে লাগল। সর্দার সাহেব এই দৃশ্য দেখে বললেন—আসাদ খাঁ, দেখ, মানুষের নজরে তুমি কত উঁচু, তোমার বীরত্বকে এখানে প্রতিটি শিশুও শ্রদ্ধা করে। এখনও তুমি বলছ যে তুমি ভীরু?

আমি হেসে বললাম—যখন থেকে এই বৃদ্ধকে মেরেছি, তখন থেকে আমার অন্তর আমাকে ধিক্কার দিচ্ছে।

সর্দার সাহেব হেসে বললেন—কারণ তুমি নিজের চেয়ে দুর্বলকে মেরেছ।

আমি বললাম—তাই হবে হয়তো।

এই সময় এক আফ্রিদি রমণী ধীরে ধীরে এসে সর্দার সাহেবের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। যেই সর্দার সাহেব দেখলেন; তার মুখ শাদা হয়ে গেল। তাঁর ভীত দৃষ্টি তার দিক থেকে ফিরে আমার দিকে এলো। আমিও আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে দেখছিলাম। সেই রমণীর মতো সুগঠিত শরীর মরদেরও কম হয়। খাকি রং-এর মোটা কাপড়ের পায়জামা এবং নীল রংএর মোটা কুর্তা পরেছিল। বালুচি মেয়েদের মতো মাথায় রুমাল বেঁধে রেখেছিল।

রং চাঁপাফুলের মতো এবং যৌবনের আভা ফুটে-ফুটে বাইরে বেরুচ্ছিল। সেই সময় তার চোখে এমন ভীষণতা ছিল, যা যে কোন মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করত। রমণীর চোখ সর্দার সাহেবের দিক থেকে ফিরে আমার দিকে এলো এবং সে এমনভাবে চোখ রাঙাতে লাগল যে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। রমণীটি সর্দার সাহেবের দিকে দেখল এবং মাটিতে থুথু ফেলল এবং তাকাতে-তাকাতে অন্যদিকে চলে গেল।

রমণীকে চলে যেতে দেখে সর্দারসাহেবের ধড়ে প্রাণ এলো। আমারও মাথা থেকে একটা বোঝা সরে গেল।

সর্দারসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি, আপনি একে চেনেন নাকি? সর্দার সাহেব একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—হ্যাঁ, বিলক্ষণ। একসময় ছিল, যখন এ আমার জন্য প্রাণ দিত এবং বাস্তবে নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে আমাকে রক্ষা করেছিল; কিন্তু এখন সে আমাকে ঘেন্না করে। ওই আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। যখনই ওকে দেখি, আমার হুঁশ চলে যায়, আর সেই ভয়ানক দৃশ্য চোখের সামনে নাচতে থাকে।

আমি ভয়-বিহ্বল স্বরে জিজ্ঞেস করি—সর্দারসাহেব, ওতো আমার দিকেও বড় ভয়ানক দৃষ্টিতে দেখেছিল। জানি না কেন আমারও রোমকূপ খাড়া হয়ে গিয়েছিল।

সর্দারসাহেব মাথা নাড়াতে নাড়াতে খুব গম্ভীরভাবে বললেন—আসাদ খাঁ, তুমি সাবধানে থেকো। হয়তো ওই বৃদ্ধ আফ্রিদির সাথে ওর কোন সম্পর্ক আছে। হয়তো ওর দাদা বা বাবা হবে। তোমার দিকে ওর তাকানোর কোন অর্থ আছে। খুব ভয়ানক স্ত্রী।

সর্দারসাহেবের কথা শুনে আমার রোমকূপ কেঁপে উঠল। আমি অন্যদিকে কথা ঘুরিয়ে বললাম—সর্দারসাহেব আপনি ওকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন? ওর ফাঁসি হয়ে যাবে।

সর্দারসাহেব বললেন—ভাই আসাদ খাঁ, ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল আর হয়তো বা এখনও আমাকে চায়। ওর কথা অনেক বড়। কখনও সময় পেলে বলব।

সর্দারের কথা শুনে আমারও কৌতুহল হচ্ছিল। আমি এই কাহিনী শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলাম। প্রথমে তো তিনি রাজী হচ্ছিলেন না, কিন্তু যখন আমি খুব জোর দিলাম তখন বাধ্য হয়ে বললেন—আসাদ, আমি তোমাকে নিজের ভাই মনে করি, তাই কোন আড়াল রাখব না। শোনো।

আসাদ খাঁ, পাঁচবছর আগে আমি এত বৃদ্ধ ছিলাম না, এখন যেমন আমাকে দেখায়। সেইসময় আমার বয়েস চল্লিশের বেশি ছিল না। একটাও

চুল পাকেনি আর এত শক্তি ছিল যে দুজন জওয়ানকে লড়িয়ে দিতাম অনায়াসে। জার্মানদের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ করেছি আর না জানি কতজনকে যমলোকের পথ দেখিয়ে দিয়েছি। জার্মান-যুদ্ধের পরে আমাকে এখানে সীমান্তে কালো পল্টনের মেজর করে পাঠানো হলো। যখন প্রথম-প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন অনেক কঠিনতা সামনে এসেছিল; কিন্তু আমি সেগুলোকে বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে ধীরে ধীরে সব কিছুর ওপর বিজয়ী হলাম। সবচেয়ে প্রথমে এখানে এসে আমি পুশ্‌তু শিখতে শুরু করি। পুশ্‌তুর পরেও অন্য ভাষা শিখি, এমনকি অত্যন্ত সহজভাবে, প্রবাদবাক্য মিশিয়ে সেসব ভাষা বলতেও থাকলাম, তারপর কয়েকজনের দল বানিয়ে দেশের ভিতরে ছেয়ে ফেললাম। এই সময় কয়েকবার মরতে-মরতে বেঁচেছি; কিন্তু সব কিছু সামলে এখানে কুশলেই থাকলাম। সেই সময় আমাকে দিয়ে এমন সমস্ত কাজ হয়েছে; যাতে সরকারে আমার খুব নাম ও প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। একবার কর্ণেল হ্যামিলটনের মেমসাহেবকে আমি একা ছাড়িয়ে এনেছিলাম, আর কত দেশী মানুষ এবং নারীর প্রাণরক্ষা করেছি। এখানে আসার তিনবছর পর থেকে আমার কাহিনী আরম্ভ হয়।

এক রাতে নিজের 'ক্যাম্পে' শুয়েছিলাম। আফ্রিদিদের সঙ্গে লড়াই হচ্ছিল। দিনভর ক্লান্ত সৈনিক পড়ে পড়ে জিরোচ্ছিল। ক্যাম্প শুনশান। শুয়ে-শুয়ে আমার ঘুম আসছিল। যখন ঘুম ভাঙল তো দেখলাম যে বুকের ওপর একজন আফ্রিদি—যার বয়েস আমার বয়েসের প্রায় দ্বিগুণ হবে—চড়াও হয়েছে আর আমার বুকে ছোরা ঢুকিয়ে দিতে উদ্যত। আমি পুরোপুরি তার অধীন ছিলাম, বাঁচার কোন উপায় ছিল না; কিন্তু সেই সময় অত্যন্ত ধৈর্য ধরে কাজ করলাম এবং পুশ্‌তু ভাষায় বললাম—আমাকে মেরো না, আমি সরকারি ফৌজ অফিসার। আমাকে ধরে নিয়ে চলো, সরকার তোমাকে টাকা দিয়ে আমাকে ছাড়াবে।

'ঈশ্বরের কৃপায়' আমার কথা তার মনে ধরল। কোমর থেকে দড়ি বার করে আমার হাত-পা বাঁধল আর তারপর কাঁধে বোঝার মতো ফেলে এলাকার বাইরে এলো। বাইরে মার-কাটের বাজার গরম ছিল। বিচিত্র ভাবে চেঁচিয়ে সে কিছু বলল এবং আমাকে কাঁধে ফেলে জঙ্গলের দিকে ছুটল। আমি বলতে পারি যে আমার ভার তার কিছুই লাগছিল না, আর খুব দ্রুত পালাচ্ছিল। তার পিছন-পিছন ক'জন লোক, যারা তারই দলের লোক, লুটের মাল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

সকালে আমরা একটি দীঘির নিকটে পৌঁছুলাম। দীঘির চারদিকে ছিল বড়-বড় পাহাড়। জল খুব নির্মল এবং এদিকে-ওদিকে গজিয়ে জঙ্গলি গাছপালা। দীঘির নিকটে পৌঁছে আমরা সকলে দাঁড়ালাম। সেই বৃদ্ধ, বাস্তবে

যে ছিল সেই দলের সর্দার, আমাকে পাথরের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। আমার কোমরে ভীষণ জোরে চোট লাগল। মনে হোলো যেন কোন হাড় ভেঙে গেছে, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তা ভাঙেনি। সর্দার আমাকে মাটিতে ফেলার পর বলল—কি কত টাকা দিবি?

আমি নিজের যন্ত্রণা চেপে বললাম—পাঁচশো টাকা।

সর্দার মুখ বিকৃত করে বলল—না, এত কমে হবে না। দুহাজার থেকে এক পয়সাও কম হলে তোমার জানের কোন ঠিক থাকবে না।

আমি কিছু চিন্তা করে বললাম—সরকার কালো মানুষের জন্য এত টাকা খরচা করবে না।

সর্দার ছোরা বাইরে বার করে বলল—'তাহলে কেন বলেছিলি যে সরকার টাকা দেবে। নে, তো এখানেই মর।'

সর্দার ছোরা নিয়ে আমার দিকে এগোল।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম—আচ্ছা সর্দার, আমি তোমাকে দু'হাজার দেওয়াব।

সর্দার থেমে গেল আর ভীষণ জোরে হেসে উঠল। তার হাসির প্রতিধ্বনি নির্জীব পাহাড়কেও কাঁপিয়ে দিল। আমি মনে-মনে বললাম—বড় ভয়ঙ্কর মানুষ।

দলের অন্যান্য লোক নিজেদের লুটের মাল সর্দারের সামনে রাখতে লাগল। তাতে কয়েকটি বন্দুক, কার্তুজ, রুটি ও কাপড় ছিল। আমারও তল্লাশী নেওয়া হলো। আমার কাছে একটি ছয় ফায়ারের রিভলবার ছিল। সেটি পেয়ে সর্দার লাফিয়ে উঠল এবং তা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। সেখানে সেই সময় ভাগ-বাঁটোয়ারা শুরু হয়ে গেল। সমান-সমান ভাগ হলো; কিন্তু আমার রিভলবার তাতে শামিল করা হলো না। ওটি ছিল সর্দার সাহেবের নিজস্ব জিনিস।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ফের যাত্রা শুরু হলো। এবার আমার পা খুলে দেওয়া হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে চলতে বলা হলো। আমার চোখে পট্টি বেঁধে দেওয়া হলো; যাতে রাস্তা না দেখতে পারি। আমার হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল, এবং তার একটি দিক একজন আফ্রিদির হাতে ছিল।

চলতে চলতে আমার পা ব্যথা করতে লাগল, কিন্তু তাদের গন্তব্য এলো না। মাথার ওপরে জ্যৈষ্ঠের সূর্য ঝল্‌সাচ্ছিল, পা পুড়ে যাচ্ছিল, পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু তারা সমানে হেঁটেই যাচ্ছিল। পরস্পর কথা বলতে বলতে ওরা যাচ্ছিল, কিন্তু তখন আমি ওদের একটি কথাও বুঝতে পারছিলাম না। কখনও কখনও এক-আধটি শব্দ তো বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু বেশিটাই ছিল দুর্বোধ্য। ওরা তখন নিজেদের বিজয়ে প্রসন্ন ছিল, এবং

কিছু আফ্রিদি নিজের ভাষায় একটি গান গাইতে শুরু করল। খুব সুন্দর গান।

আসাদ খাঁ বলল—সর্দার সাহেব, কি ছিল সেই গান?

সর্দারসাহেব বললেন—ঐ গানের ভাব মনে আছে। একজন আফ্রিদি যখন যাচ্ছে তখন তার স্ত্রী বলছে—কোথায় যাচ্ছ?

যুবক উত্তর দিচ্ছে—যাচ্ছি তোমার জন্য রুটি আর কাপড় আনতে।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করছে—নিজের বাচ্চাদের জন্য কিছু আনবে না?

যুবক বলছে—বাচ্চাদের জন্য আনব বন্দুক, কারণ যখন সে বড় হবে তখন যেন সেও লড়াই করে নিজের প্রেমিকার জন্য রুটি ও কাপড় আনতে পারে।

স্ত্রী বলছে—এখন বলো, কবে ফিরবে?

যুবক বলছে—তখনই ফিরব, যখন কিছু জিতে আনব, নয়তো ওখানেই মরব।

স্ত্রী বলছে—শাবাশ, তুমি বীর, তুমি নিশ্চয়ই সফল হবে।

গান শুনে আমি মুগ্ধ হলাম।' গান শেষ হতে হতে আমরাও থামলাম। আমার চোখ খোলা হলো। সামনে ছিল বড় মাঠ এবং চারদিকে গুহা, যেখানে ওরা বাস করত।

আবার আমাকে তল্লাশি করা হলো, আর এবার সমস্ত কাপড় খুলে নেওয়া হলো, শুধু পায়জামা বাদে। সামনে একটি বড় শিলাখণ্ড ছিল। সকলে মিলে সেটি সরিয়ে আমাকে সেদিকে নিয়ে চলল। আমার আত্মা কেঁপে উঠল। এরা তো জীবন্ত কবর দেবে। আমি অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে সর্দারের দিকে তাকিয়ে বললাম—সর্দার, সরকার তোমাকে টাকা দেবে। আমাকে মেরো না।

সর্দার হেসে বলল—তোমাকে কে মারছে, বন্দী করা হচ্ছে। এই ঘরে বন্ধ থাকবে, যখন টাকা এসে যাবে, তখন ছেড়ে দেওয়া হবে।

সর্দারের কথা শুনে আমার ধড়ে প্রাণ ফিরল। সর্দার আমার পকেটবুক ও পেন্সিল সামনে রেখে বলল—নাও এতে লিখে দাও। যদি এক পয়সাও কম আসে, তো তোমার জান খতরা।

আমি কমিশনার সাহেবের নামে একটি পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলাম। ঐ লোকগুলো আমাকে সেই অন্ধকূপে ঝুলিয়ে দিয়ে দড়ি টেনে নিয়ে নিল।

৩

সর্দার সাহেব একটি দীর্ঘশ্বাস নিল এবং বলতে শুরু করল—'আসাদ খাঁ, যে সময়ে আমাকে সেই কুয়াতে ঝোলানো হচ্ছিল, আমার অন্তরাত্মা কাঁপছিল। নীচে ঘনঘোর অন্ধকারের জায়গায় হালকা জ্যোৎস্না ছিল। ভেতরে

গুহা না বেশি ছোট ছিল না বেশি বড়। মেঝে ছিল খরখরে, মনে হচ্ছিল যেন বহু বছর এখানে জলের ধারা পড়েছে এবং তাই এই গাড্ডা তৈরি হয়েছে। পাথরের মোটা দেওয়ালে সেই কূপ ঘেরা ছিল আর যেখানে-সেখানে ছেদ ছিল, যার ভিতর দিয়ে আলো-হাওয়া আসত। নীচে পৌঁছে আমি নিজের অবস্থার হেরফের চিন্তা করছিলাম। ভীষণ ভয় করছিল, কালকুঠুরীর যন্ত্রণা ভোগ করাও ভাগ্যে বিধাতা লিখে দিয়েছিল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এলো। তখন পর্যন্ত ওরা আসার কোন খোঁজ-খবর নেয়নি। খিদেয় প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। বারবার বিধাতা ও নিজেকে দোষারোপ করছিলাম। যখন মনুষ্য নিরুপায় হয়ে যায়, তখন বিধাতাকে দোষ দেয়।

শেষ পর্যন্ত একটি ফুটো দিয়ে চারটি বড় বড় রুটি কেউ বাইরে থেকে ফেলল। কুকুর যেমন একটি রুটির টুকরোর ওপর ছুটে যায়, তেমনই আমি ছুটলাম এবং সেই ছিদ্রপথে দেখতে লাগলাম, কিন্তু কেউ আর কিছু ফেলল না, আর কোন আদেশও পাওয়া গেল না। বসে বসে রুটি খেতে লাগলাম। একটু পরে সেই ছিদ্রতে একটি লোহার পেয়ালা রেখে দেওয়া হলো, তাতে জল ভরা ছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে জল তুলে খেলাম। যখন প্রাণ একটু ঠাণ্ডা হলো, তখন বললাম—আরেকটু জল চাই।

একথায় দেওয়ালের ঐদিকে একটি ভীষণ হাসির প্রতিধ্বনি শোনা গেল এবং কে যেন খোনা স্বরে বলল—জল আবার কাল পাওয়া যাবে। পেয়ালা দিয়ে দাও, নইলে কাল জল পাবে না।

কি করব, হেরে গিয়ে পেয়ালা ঐখানে রেখে দিলাম।

এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। রোজ দুবার চারটি রুটি ও এক পেয়ালা জল পাওয়া যেতো। ধীরে ধীরে আমিও এই শুষ্ক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। এখন আর নির্জনতা অত বিঁধত না। কখনও কখনও নিজের ভাষায় আর কখনও পুশ্‌তু-তে গাইতাম। এতে আমার শরীর অনেকটা ভালো থাকত আর অন্তরও শান্ত হতো।

একদিন রাত্রিতে আমি একটি গীত গাইছিলাম। মজনু ঝলসে দেওয়া বকদের বলছিল—তোমার কি সেই জ্বালা নেই, যা কাফলাক জ্বেলে খাক করে দেয়। কিন্তু সেই গরম আমাকে কেন জ্বালায় না? এজন্য কি যে আমার ভিতরে এক জ্বালা স্বয়ং জ্বলছে?

দেখ যখন লায়লা খুঁজতে খুঁজতে এখানে আসবে, তখন আমার শরীর বালি দিয়ে ঢেকে দিও, নইলে কাচের মতো লায়লার মন ভেঙে যাবে।

আমি গান বন্ধ করে দিলাম। সেই সময় ছিদ্র দিয়ে কেউ বলল—'বন্দী, আরেকবার গাও!

আমি চমকে গেলাম, কিছু খুশিও হলো, কিছু আশ্চর্যও; জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কে?

সেই ছিদ্র থেকেই উত্তর এলো—আমি তুরয়া, সর্দারের মেয়ে।

বললাম—তোমার কি এই গান ভাল লাগে?

তুরয়া বলল—হ্যাঁ, বন্দী গাও, আমি ফের শুনতে চাই।

আমি আনন্দে গাইতে লাগলাম। গীত সমাপ্ত হবার পর তুরয়া বলল—তুমি রোজ এই গান আমাকে শোনাবে, বদলে তোমাকে আরও রুটি ও জল দেবো।

তুরয়া চলে গেল। এরপর রোজ রাতে সেই গান গাইতাম আর তুরয়া সবসময় দেওয়ালের কাছে এসে শুনত।

আমার মনোরঞ্জনের একটি আরো পথ বেরিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে এক মাস কেটে গেল; কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাকে ছাড়াতে কেউ টাকা নিয়ে এলো না। যেমন-যেমন দিন কাটছিল, আমি নিজের জীবনে নিরাশ হয়ে পড়ছিলাম।

ঠিক এক মাস বাদে সর্দার এসে বলল—বন্দী, যদি কাল পর্যন্ত টাকা না আসে, তো তোমাকে মেরে ফেলা হবে। আমি আর রুটি খাওয়াতে পারব না।

আমার জীবনের কিছু আশা রইল না। সেদিন না কিছু খেলাম, না কিছু পান করলাম। রাত হলো, আবার রুটি ফেলা হলো; কিন্তু খেতে ইচ্ছা হলো না।

নিশ্চিত সময়ে তুরয়া এসে বলল—বন্দী, গান গাও।

সেদিন আমার কিছু ভাল লাগছিল না, চুপ করে রইলাম।

তুরয়া আবার বলল—বন্দী, শুয়ে পড়েছ?

আমি অত্যন্ত মলিন স্বরে বললাম—না, আজ শুয়ে কি করব, কাল এমন শোয়া শোব যে আর জাগতে হবে না।

তুরয়া প্রশ্ন করল—কেন, সরকার কি টাকা দেবে না?

আমি বললাম—পাঠাবে, কিন্তু কাল তো আমাকে মেরে ফেলা হবে, মরবার পর টাকা এলেও আমার কি কাজে লাগবে!

তুরয়া সান্ত্বনাপূর্ণ স্বরে বলল—আচ্ছা, তুমি গাও, কাল আমি তোমাকে মরতে দেবো না।

আমি গাইতে শুরু করলাম। যাবার সময় তুরয়া বলল—বন্দী, তুমি কাঠঘরে থাকা পছন্দ কর?

আমি সহাস্যে উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, কোনরকমে এই নরক থেকে তো মুক্তি পাই।

তুরয়া বলল—আচ্ছা কাল আমি বাবাকে বলব।

পরের দিনই আমাকে সেই অন্ধকূপ থেকে বাইরে আনা হলো, আমার দুটি পা দুটি মোটা কাঠের ছিদ্রে বন্ধ করে দেওয়া হলো। আর কাঠের পেরেক দিয়ে প্রাকৃতিক গাড্ডায় আটকে দেওয়া হলো।

সর্দার আমার কাছে এসে বলল—বন্দী, পনের দিন সময় আরো দিচ্ছি, এর পরে তোমার মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা করে দেওয়া হবে। আজ নিজের ঘরে আরেকটি চিঠি লেখো। যদি ঈদ পর্যন্ত টাকা না আসে, তো তোমাকে হত্যা করা হবে।

আমি অন্য চিঠি লিখে দিয়ে দিলাম।

সর্দার চলে যাবার পর তুরয়া এলো, এ ছিল সেই রমণী, যে এখন গেল। এ সেই সর্দারের মেয়ে। এই আমার গান শুনত এবং এই সুপারিশ করে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

তুরয়া এসে আমাকে দেখতে লাগল। আমিও ওকে দেখতে লাগলাম।

তুরয়া বলল—বন্দী, ঘরে তোমার কে কে আছে?

আমি অত্যন্ত কাতর স্বরে বললাম—'দুটি ছোট ছোট বালক; আর কেউ নেই।'

আমি জানতাম যে আফ্রিদি বাচ্চাদের খুব ভালবাসে।

তুরয়া বলল—ওদের মা নেই?

আমি ওর সহানুভূতি আদায়ের জন্য বললাম—না, ওদের মা মরে গেছে। ওরা একা, জানি না, বেঁচে আছে না মরে গেছে; কারণ আমি ছাড়া ওদের দেখাশোনা করার আর কেউ ছিল না।

বলতে বলতে আমার চোখে জল ভরে এলো। তুরয়ার চোখও শুকনো থাকল না। তুরয়া নিজের আবেগ সামলাতে সামলাতে বলল—তো তোমার কেউ নেই? বাচ্চারা একা? খুব কাঁদছে হয়তো!

আমি মনে মনে প্রসন্ন হয়ে বললাম—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খুব কাঁদছে। কে জানে, হয়তো মরেই গেছে।

তুরয়া কথা কেটে বলল—না, এখনও মরেনি, আচ্ছা, তুমি থাকো কোথায় আমি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব।

আমি নিজের ঘরের ঠিকানা বলে দিলাম। ও বলল—ওখানে তো আমি কয়েকবার হয়ে এসেছি। বাজার থেকে সওদা আনতে প্রায়ই যাই, এখন যখন যাব, তখন তোমার বাচ্চাদের খবরও নিয়ে আসব।

আমি সশঙ্কিত অন্তরে বললাম—কবে যাবে?

ও কিছু ভেবে বলল—সামনের পূর্ণিমায় যাব। আচ্ছা, তুমি সেই গান গাও।

আমি আজ অত্যন্ত উৎসাহ ও উত্তেজনায় গাইতে শুরু করলাম। আমি আজ দেখলাম যে তুরয়ার ওপর তার কেমন প্রভাব পড়ে। ওর শরীর কাঁপছিল, চোখ ভিজে এলো, গাল ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং ও কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। ওর অবস্থা দেখে আমি দ্বিগুণ উৎসাহে গান শুরু করলাম এবং শেষে বললাম—তুরয়া, যদি আমি মারা যাই, তো আমার বাচ্চাদের মৃত্যুর খবর দিয়ে দিও।

আমার কথার পুরো প্রভাব পড়ল। তুরয়া ভাঙা স্বরে বলল—বন্দী, তুমি মরবে না। তোমার বাচ্চাদের জন্য তোমাকে ছেড়ে দেব।

আমি নিরাশ হয়ে বললাম—তুরয়া, তুমি ছাড়লেও আমি কি বাঁচব এই জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মরে যাব, আর তোমার ওপরও তো ঝামেলা হতে পারে। নিজের প্রাণের জন্য তোমাকে বিপদে ফেলব না।

তুরয়া বলল—আমার জন্য চিন্তা করো না। আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। আমি সর্দারের মেয়ে, যা বলব, তাই সবাই মেনে নেবে, কিন্তু তুমি কি গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেবে?

আমি খুশি হয়ে বললাম—হ্যাঁ তুরয়া, আমি টাকা পাঠিয়ে দেব।

তুরয়া যেতে যেতে বলল—তো আমিও তোমাকে মুক্তি দেব।

এই ঘটনার পরে তুরয়া সবসময় আমার বাচ্চাদের সম্বন্ধে কথা বলত। আসাদ খাঁ, সত্যি সত্যি এই আফ্রিদিরা শিশু খুব ভালবাসে। বিধাতা যদি ওদের বর্বর হিংস্র পশু বানিয়ে থাকে, তো মনুষ্যোচিত প্রকৃতি থেকেও বঞ্চিত করেনি। শেষে পূর্ণিমা এলো এবং এখন পর্যন্ত সর্দার ফিরে আসেনি। না ঐ দলের কোন মানুষ ফেরত এসেছে। সেদিন সন্ধ্যায় তুরয়া এসে বলল—'বন্দী, এখন আমি তো যেতে পারব না, কারণ আমার বাবা এখনও আসেনি! যদি কালও না আসে, তো আমি তোমাকে রাতে ছেড়ে দেব। তুমি নিজের বাচ্চাদের কাছে যেয়ো, কিন্তু দেখো টাকা পাঠাতে ভুলো না! আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

সেদিন খুব উৎসাহভরে গান গাইলাম। মাঝরাত পর্যন্ত তুরয়া শুনতে থাকল, তারপর শুতে চলে গেল। আমিও ঈশ্বরকে বলতে থাকলাম যেন কাল পর্যন্ত সর্দার যেন না আসে। কাঠে বাঁধা অবস্থায় আমার পা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। সারা শরীর ব্যথা করছিল। এর চেয়ে তো কালকুঠুরীতেই ভালো ছিলাম, কারণ ওখানে তো হাত-পা নাড়াতে পারতাম।

পরের দিনও দল ফিরে এলো না। সেদিন তুরয়া খুব চিন্তিত ছিল। সন্ধ্যায় এসে তুরয়া আমার পা খুলে বলল—বন্দী এখন তুমি যাও। চলো, আমি তোমাকে কিছুদূর পৌঁছে দিই।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমি অবশ শুয়ে রইলাম, আস্তে আস্তে আমার পা ঠিক

হলো এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি তুরয়ার সঙ্গে রওনা হলাম।

তুরয়াকে খুশি করার জন্য সারা রাস্তা গান গাইতে গাইতে এলাম। তুরয়া বার বার শুনত আর কাঁদত। মাঝরাতের কাছাকাছি পুকুরের কাছে পৌঁছুলাম। ওখানে পৌঁছে তুরয়া বলল—সোজা চলে যাও, পেশোয়ার পৌঁছে যাবে। দেখ, সাবধানে যাবে, না তো কেউ তোমাকে নিজের গুলির শিকার বানাবে, এই নাও; তোমার কাপড়, কিন্তু টাকা অবশ্যই পাঠিয়ে দিও। তোমার জামানত আমি নেব, যদি টাকা না আসে তো আমারও প্রাণ যাবে আর তোমারও। আর টাকা এসে গেলে, কোন আফ্রিদি তোমার ওপর হাত তুলবে না, একবার তুমি কাউকে মেরে ফেললেও না। যাও, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন এবং তোমার বাচ্চাদের সাথে মিলিত করুন।

তুরয়া আর দাঁড়ালো না, গুনগুন করতে করতে ফিরে গেল। রাত দুই প্রহর কেটে গেছিল, চারদিকে ভয়ানক নিস্তব্ধতা, হাওয়ার শন-শন শব্দ কেবল। আকাশের মাঝখানে চাঁদ ষোলকলায় চকমক করছিল। পুকুরপাড়ে থামা সুরক্ষিত ছিল না। ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকে এগোলাম। বার বার চারদিকে দেখছিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় সকাল হতে হতে পেশোয়ারের চৌমাথায় পৌঁছে গেলাম।

চৌমাথায় সিপাহীদের পাহারা ছিল। আমাকে দেখতেই সমস্ত ফৌজ হৈচৈ শুরু হলো। সকলেই আমাকে মৃত ভেবে নিয়েছিল। বেঁচে ফিরে আসতে দেখে সকলে প্রসন্ন হলো।

কর্ণেল হ্যামিলটন সাহেবও খবর পেয়ে তখনই দেখা করতে এলেন এবং সব খবর জিজ্ঞেস করে বললেন—মেজর সাহেব, আমি তোমাকে মৃত ভাবতাম, আমার কাছে তোমার দুটি পত্র এসেছিল; কিন্তু আমার স্বপ্নেও বিশ্বাস হয়নি যে ওগুলো তোমার লেখা। ভাবতাম ওগুলো জাল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি বেঁচেবর্তে ফিরে এসেছ।

কর্ণেল সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে মনে মনে বললাম—কালো মানুষের লেখা জাল; আর যদি গোরা লিখত, তো দুইয়ের বদলে চার হাজার টাকা পৌঁছে যেতো। কত যে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হতো আরও না জানি কি কি হতো।

আমি চুপচাপ ঘরে এলাম, বাচ্চাদের পেয়ে আত্মা সন্তুষ্ট হলো। সেইদিন এক বিশ্বাসী অনুচর দ্বারা দুহাজার টাকা তুরয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

৪

সর্দার একটি ঠাণ্ডা শ্বাস নিয়ে বলল—'আসাদ খাঁ এখন আমার কাহিনী সমাপ্ত হয়নি। এখন তো দুখভিত্তি ভোগ বাকিই আছে। এখানে এসে আমি ধীরে ধীরে নিজের সব অসুবিধা ভুলে গেলাম, কিন্তু তুরয়াকে ভুলতে

পারিনি। তুরয়ার কৃপায় নিজের স্ত্রী আর বাচ্চাদের সাথে মিলতে পেরেছিলাম। এটুকুই না, জীবনও পেয়েছিলাম তাহলে তাকে কি করে ভুলব বল!

মাস ও বছর কেটে গেল। না তুরয়া না তার বাবাকে দেখলাম, তুরয়া আসবে বলেও আসেনি। ওখান থেকে ফিরে স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ খেয়াল ছিল যে তুরয়া যদি আসে তো মিথ্যাবাদী হতে হবে। কিন্তু যখন তিনবছর কেটে গেল এবং তুরয়া এলো না, তো নিশ্চিন্ত হলাম, স্ত্রীকে নিয়ে এলাম, আমরা সুখেই দিন কাটাচ্ছিলাম, সহসা দুর্দশা ফিরে এলো।

একদিন সন্ধ্যাবেলা এই বারান্দায় বসে নিজের স্ত্রীর সাথে কথা বলছিলাম তখন কেউ বাইরের দরজা খট্‌খট্ করল। চাকর দরজা খুলে দিল আর একেবারে ভিতরে হঠাৎ করে একটি কাবুলি মহিলা চলে এলো। সে বারান্দায় এসে বিশুদ্ধ পুশ্‌তু ভাষায় বলল—সর্দার সাহেব কোথায়?

আমি ঘরের মধ্যে এসে বললাম—তুমি কে, কি চাও?

সেই স্ত্রী কিছু বাদাম বার করতে করতে বলল—এই বাদাম বেচতে এসেছি, কিনবেন?

এই বলে সে বড় বড় বাদাম বার করে টেবিলের ওপর রাখল।

আমার স্ত্রীও আমার সাথে ঘরের ভিতরে এসেছিল; সে বাদাম তুলে দেখতে লাগল। সেই কাবুলি স্ত্রী বলল—সর্দারসাহেব, এ আপনার কে?'

আমি বললাম—আমার স্ত্রী, আবার কে?

কাবুলি স্ত্রী বলল—আপনার স্ত্রী তো মরে গিয়েছিল; আপনি কি দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন?

আমি রোষপূর্ণ শব্দে বললাম—চুপ, বেওকুফ কোথাকার!

আমার স্ত্রী পুশ্‌তু জানত না, সে তন্ময় হয়ে বাদাম দেখছিল।

কিন্তু আমার কথা শুনে না জানি কেন কাবুলি মহিলার চোখ জ্বলে উঠল। সে অত্যন্ত তীব্র স্বরে বলল—বেওকুফ না হলে তোমাকে কি ছেড়ে দিতাম? শয়তান, মিথ্যা বলেছিলি আমাকে! নে, যদি তোর স্ত্রী তখন না মরেছিল তো, এখন মরে গেল।

বলতে বলতে বাঘিনীর মতো লাফ দিয়ে একটি ধারালো ছোরা আমার স্ত্রীর বুকে বসিয়ে দিল। আমি ওকে আটকাতে এগোলাম কিন্তু ও লাফ দিয়ে উঠোনে চলে গিয়ে বলল—এবার চিনে রাখ, আমি তুরয়া, আজ থাকতে এসেছিলাম তোর ঘরে। তোকে বিয়ে করে তোর হয়ে থাকতাম। তোর জন্য বাপ, ঘর সবই ছেড়েছিলাম, কিন্তু তুই মিথ্যুক, ঠগ। তুই বৌ-এর জন্য কাঁদ, আমি আজ তোর জন্য কাঁদব। এই বলে দ্রুত নীচে চলে গেল।

এখন আমি নিজের স্ত্রীর কাছে পৌছুলাম। ছোরা ঠিক হৃদয়ে লেগেছিল।

একটি বারে তার কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ডাকলাম, কিন্তু সে তখন মৃত।

বলতে বলতে সর্দারের চোখে জল ভরে এলো। তিনি নিজের ভিজে চোখ মুছে বললেন—আসাদ খাঁ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তুরয়া এত পিশাচ-হৃদয় হতে পারবে। যদি আমি প্রথম থেকেই ওকে চিনতে পারতাম তো এই বিপদ হতো না, কিন্তু ঘরে অন্ধকার, আর এছাড়া আমি ওর তরফে নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম।

তখন থেকে তুরয়া আর কখনও আসেনি। আজ যখনই আমাকে কখনো দেখে তো আমার দিকে দেখে নাগিনীর মতো ফোঁস-ফোঁস করতে করতে চলে যায়। ওকে দেখে অন্তর কেঁপে ওঠে। আমি অবশ হয়ে পড়ি। কয়েকবার চেষ্টাও করেছি যে ওকে ধরিয়ে দিই কিন্তু ওকে দেখে আমি একেবারে অকেজো হয়ে পড়ি। হাত-পা দুর্বল হয়ে পড়ে, সমস্ত বীরত্ব হাওয়া হয়ে যায়।

তাই না, তুরয়ার এখনও আমার প্রতি মোহ আছে। আমার বাচ্চাদের ও সবসময় কিছু না কিছু বহুমূল্য বস্তু দিয়ে যায়। যেদিন ওদের দেখা পায় না, দরজার ভিতরে ফেলে যায়। তাতে একটি কাগজের টুকরো বাঁধা থাকে, যাতে লেখা থাকে—সর্দার সাহেবের বাচ্চাদের জন্য।

এখনও আমি এই নারীকে বুঝতে পারিনি। যতই বুঝতে চেষ্টা করি, ততই তা কঠিন হয়ে পড়ে। বুঝতে পারি না সে মানবী নাকি রাক্ষসী!

এইসময় সর্দারসাহেবের ছেলে এসে বলল—দেখুন, সেই মহিলা এই সোনার তাবিজ দিয়ে গেছে।

সর্দারসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখেছ, আসাদ খাঁ, আমি তোমাকে বলতাম না, দেখেছ, আজও এই তাবিজ দিয়ে গেছে। জানিনা কত তাবিজ আর অন্য কত কিছু অর্জুন আর নিহালকে দিয়ে গেছে। বলেছি যে তুরয়া অত্যন্ত বিচিত্র নারী।

৫

সর্দারসাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে গেলাম। চৌরাস্তা থেকে বৃদ্ধের লাশ সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেখানে পৌঁছে আমার রোমকূপ খাড়া হয়ে গেল। আপনা আপনি সেখানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে পড়লাম। হঠাৎ পিছনে তাকালাম। ছায়ার মতো একটি নারী আমার পিছু নিয়েছিল। আমাকে দাঁড়াতে দেখে সেই নারী থেমে গিয়ে দোকান থেকে কিছু কিনতে লাগল।

আমি মনকে প্রশ্ন করলাম—এই কি তুরয়া।

মন জবাব দিল—হ্যাঁ, হয়তো এই।

তুরয়া কেন আমার পিছু নিয়েছে? এই ভাবতে ভাবতে ঘরে পৌঁছুলাম এবং খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু আজকের ঘটনার আমার ওপর এমন প্রভাব পড়েছিল যে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। যতই ঘুমোতে চেষ্টা করি, ততই ঘুম পালিয়ে যায়।

ফৌজী ঘড়িতে বারোটা বাজল, একটা বাজল, দুটো বাজল, কিন্তু আমার ঘুম আসছিল না। এসব ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুম এসেছিল, মনে নেই।

যদিও আমি ঘুমিয়ে ছিলাম তবু আমার জ্ঞান জেগে ছিল, মনে হলো যেন কোন স্ত্রী, যার আকৃতি তুরয়ার সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। কিন্তু ওর থেকেও যেন আরো ভয়ঙ্কর, দেওয়াল ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তার হাতে একটি তীক্ষ্ণ ছোরা, যা লণ্ঠনের আলোতে চক্‌চক্ করছিল। সে পা টিপে সতর্ক চোখে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগোচ্ছে। ওকে দেখে আমি উঠতে চাইছি, কিন্তু হাত-পা আমার বশে নেই। যেন ওগুলো প্রাণহীন। সেই নারী আমার কাছে পৌঁছে গেল। কিছুক্ষণ আমার দিকে দেখে নিজের ছোরাসুদ্ধ হাত তুলল। আমি চেঁচানোর উপক্রম করলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না। সে আমার দুটি হাত নিজের হাঁটুর নীচে চেপে রাখল। তারপর আমার বুকে চেপে বসল। আমি ছটফট করছিলাম, আমার চোখ খুলে গেল। সত্যিই একটি কাবুলি মহিলা আমার বুকে চেপে বসেছিল, তার হাতে ছোরা, আর সে ছোরা বসাতে চাইছিল।

আমি বললাম—কে, তুরয়া?

বাস্তবিক সে ছিল তুরয়া। সে আমাকে জোর করে চেপে ধরে বলল—হ্যাঁ, আমিই তুরয়া। আজ তুই আমার বাপকে খুন করেছিস, তার বদলে তোর প্রাণ যাবে।

এই বলে সে হাতের ছুরি ওপরে ওঠালো। এই সময় আমার সামনে জীবন-মরনের প্রশ্ন। জীবনের লালসা আমাতে সাহস সঞ্চার করল। আমি মরতে রাজি ছিলাম না, আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা এখনও বাকি। আমি বলপূর্বক নিজের ডানহাত ছাড়াতে চেষ্টা করলাম এবং এক ঝট্‌কায় আমার হাত মুক্ত হয়ে গেল। আমি নিজের সম্পূর্ণ জোরে তুরয়ার ছোরাসুদ্ধ-হাত ধরে ফেললাম। কেন জানিনা তুরয়া কোন বিরোধ করল না। সে আমার হাত দেখতে দেখতে আমার বুকের ওপর থেকে নেমে এলো। ওর চোখে অপলক দৃষ্টি আমার হাতের দিকেই নিবদ্ধ ছিল।

আমি হেসে বললাম—তুরয়া এবার তো পাশার দান উলটে গেল। এবার তোর মরার পালা। তোর বাপকে মেরেছি আর এখন তোকেও মারব।

তুরয়া এখনও একদৃষ্টে দেখছিল আমার হাত। কোন উত্তর দিল না।

আমি ওকে ঝঙ্কার দিয়ে বললাম—কথা বলছিস্ না যে! এখন তো তোর জান আমার মুঠোয়।

তুরয়ার মোহভঙ্গ হলো। সে অত্যন্ত গম্ভীর ও দৃঢ়কণ্ঠে বলল—তুই আমার ভাই। নিজের বাপকে তুই মেরেছিস্ আজ!

তুরয়ার কথা শুনে সেই মুহূর্তে হাসি পেলো আমার।

হাসতে হাসতে বললাম—আফ্রিদি কপট হয়, তা আমি আজই জানলাম।

তুরয়া শান্তস্বরে বলল—তুই আমার হারিয়ে যাওয়া বড়ভাই নাজির। ওই যে তোর হাতের নিশান, এটাই বলছে যে তুইই আমার হারিয়ে যাওয়া ভাই।

শৈশব থেকেই আমার হাতে একটি সাপ খোদিত করা ছিল। আর এই চিহ্নই আমার শনাক্তকরণ হিসেবে ফৌজী রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা ছিল।

আমি হেসে বললাম—তুরয়া, তুই আমাকে ভোলাতে পারবি না। আমি আজ তোকে কিছুতেই ছাড়ব না।

তুরয়া নিজের হাত থেকে ছোরা ফেলে দিয়ে বলল—সত্যিই তুই আমার ভাই। যদি বিশ্বাস না হয়, তো দ্যাখ, আমারও ডান হাতে এমনি সাপ খোদাই আছে।

আমি তুরয়ার হাতে দৃষ্টি দিলাম, ওখানেও হুবহু আমারই মতো সাপ আঁকা ছিল।

আমি একটু ভেবে বললাম—তুরয়া, আমি তোকে বিশ্বাস করি না, এটা ঘটনাচক্র।

তুরয়া বলল—আমার হাত ছেড়ে দে! আমি তোকে আক্রমণ করব না। আফ্রিদি মিথ্যা বলে না।

আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম। ও নীচে বসে পড়ে আমার দিকে দেখছিল। একটু পরে বলল—আচ্ছা, তোর নিজের মা-বাবার কথা মনে আছে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম—না, আমি সরকারী অনাথ আশ্রমে বড় হয়েছি।

আমার কথা শুনে তুরয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তুই আমার হারিয়ে যাওয়া বড় ভাই নাজিরই। আমার জন্মের এক বছর আগে তুই হারিয়েছিলি। তখন আমার মা-বাবা সরকারী ফৌজে হানা দিতে এসেছিল আর তুইও সাথে ছিলি। আমার মা লড়াইয়ে খুব হুঁশিয়ার ছিল। তুই মার পিঠে বাঁধা ছিলি আর মা লড়ছিল। সেইসময় মার পায়ে গুলি লাগে আর মা পড়ে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে যায়। ব্যস, কেউ অমনি তোকে খুলে নিয়ে যায়। মাকে বাবা কাঁধে তুলে এনেছিল, কিন্তু তোকে খুঁজতে পারেনি। অনেক খুঁজেছিল পরে, কিন্তু কোথাও পায়নি। মা সবসময় তোর কথাই বলত। মার হাতেও এই চিহ্ন ছিল।

একথা বলে ও সেই হাত আমাকে দেখাল। আমি ওর আর আমার সাপ মেলাতে শুরু করলাম। বাস্তবিক দুটি সাপ হুবহু একরকম, বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই। আমি হতাশ হয়ে চৌপায়াতে বসে পড়লাম।

তুরয়া আমার কাছে বসে স্নেহভরে আমার মাথার ঘাম মুছতে লাগল। ও বলল—নাজির, মা বলত যে তুই মরিসনি, বেঁচে আছিস্। একদিন নিশ্চয়ই আমাদের সাথে তোর দেখা হবে।

এখন তুরয়ার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছিল। জানি না কে যেন আমার অন্তরে বসে বলছিল তুরয়া যা বলছে, ঠিক। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম—কি তুরয়া, আমি আজ যাকে মেরেছি, সে আমাদের বাবা ছিল।

তুরয়ার মুখে শোকের ছোট মেঘ ঘিরে এলো। অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ স্বরে ও বলল—হ্যাঁ নাজির, সে অভাগা আমাদের বাবাই ছিল। কে জানত যে সে নিজের প্রিয় পুত্রের হাতে শেষ হয়ে যাবে!

তারপর সান্ত্বনাপূর্ণ স্বরে বলল—কিন্তু নাজির তুই তো অজান্তে এই কাজ করেছিস। বাবা মরার পর আমি একেবারে একা হয়ে পড়েছিলাম; কিন্তু এখন তোকে পেয়ে আমি বাবার দুঃখ ভুলে যাব। নাজির, আফশোষ্ করিস না। তুই কি আর জানতিস যে কে তোর বাপ আর কে তোর মা। দ্যাখ, আমিই তোকে মারতে এসেছিলাম, তোকে মেরেই ফেলতাম; কিন্তু খোদার মেহেরবানি, আমি নিজেদের খানদানি চিহ্ন দেখে ফেললাম! খোদার মর্জি তাই ছিল।

তুরয়ার কাছে জানলাম আমার বাপের নাম ছিল হায়দার খাঁ, সে আফ্রিদিদের একটি দলের সর্দার ছিল। আমি সর্দার হিম্মত সিংহের সম্বন্ধে তুরয়ার সঙ্গে কথা বললাম—জানতে পারলাম যে তুরয়া সর্দারসাহেবকে ভালবাসত। ও বাবার সাথে লড়াই করেই সর্দারসাহেবকে বিয়ে করতে এসেছিল; কিন্তু সেখানে তাঁর স্ত্রীকে দেখে সে ঈর্ষা ও ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল, এবং তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলে। কাবুলি স্ত্রীর পোশাকে গিয়ে ও একটু মজা করতে গিয়েছিল, কিন্তু ঘটনাচক্র তাকে অন্যদিকে নিয়ে গেল।

আমি সর্দারসাহেবের দশা বর্ণনা করলাম। শুনে ও যেন কিছু চিন্তা করতে লাগল, তারপর বলল—না, সেই লোকটা মিথ্যুক, ধাপ্পাবাজ। আমি ওকে বিয়ে করব না। কিন্তু তোর খাতিরে এবার সমস্ত ভুলে যাব, কাল ওর বাচ্চাদের নিয়ে এসো, আমি আদর করব।

সকালে তুরয়াকে দেখে আমার চাকর আশ্চর্য হয়ে গেল। আমি ওকে বললাম—এ আমার সহোদরা ভগ্নী।

চাকর বোনের ব্যাপারটা বিশ্বাস করল না। তখন আমি সবিস্তারে সমস্ত বললাম এবং তখনই বাবার মৃতদেহের খবর আনতে পাঠালাম।

চাকর এসে বলল—লাশ এখনও থানাতেই আছে।

আমি বড়সাহেবের নামে একটি চিঠি লিখে সমস্ত জানিয়ে দিলাম এবং আমি লাশ পাবার জন্য দরখাস্তের স্বীকৃতি তখনই সাহেবের কাছ থেকে এসে গেল। একটি চিঠি লিখে মেজর সাহেবকেও ডাকলাম।

মেজর সাহেব এসে বললেন—কি ব্যাপার, আসাদ? এত জোর তলব?

আমি হেসে বললাম—মেজর সাহেব, আমার নাম আসাদ আর নেই। আমার আসল নাম নাজির।

মেজর সাহেব আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—রাতের মধ্যে কি তুমি পাগল হয়ে গেলে?

আমি হেসে বললাম—না সর্দার সাহেব, আরো শুনুন। তুরয়া আমার মায়ের পেটের বোন আর যাকে কাল মেরেছি, সে ছিল আমার বাবা।

সর্দারসাহেব আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন—আসাদ তুমি কি আমাকেও পাগল করে দেবে?

আমি সর্দারসাহেবের হাত ধরে বললাম—আসুন, তুরয়ার মুখ থেকেই সব কিছু শুনুন। তুরয়া এখানে বসে আপনার প্রতীক্ষা করছে।

সর্দারসাহেব সন্দেহ করতে করতে আমার পিছনে এলেন। তাঁকে আসতে দেখে তুরয়া উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল—বন্দী, তুমি সেই গানটি আবার গাও।

তুরয়ার কথা শুনে আমি আর সর্দারসাহেব হাসতে লাগলাম।

সর্দারসাহেবকে বসিয়ে আমি সবিস্তারে সব বললাম—কাহিনী শুনে সর্দার আমাকে বললেন—নাজির, এখন তোমাকে নাজিরই বলব, তুরয়াকে আমি চাইছি। আমি ওকে বিয়ে করব।

আমি হেসে বললাম—কিন্তু আপনি হিন্দু আর আমরা মুসলমান।

সেই সময় তুরয়া বলল—কিন্তু সর্দারসাহেব, আমি তোমাকে বিয়ে করব না। হ্যাঁ, যদি তুমি তোমার দুটি বাচ্চাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, তো আমি ওদের মা হতে পারি।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি সর্দারসাহেব, তুরয়া ও অন্যান্য পলটন মিলে নিজের বাপের লাশ কবর দিলাম।

সূর্য ডুবছিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছিল আর আমরা দুজন, তুরয়া ও আমি, নিজের বাবার কবরে ফাতিহা পড়ছিলাম।

মূল থেকে অনুবাদ ঃ দীপা বিশ্বাস

প্রসঙ্গ ঃ রাগ মালকৌশ

ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে রাগ মালকৌশ অতি বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত। এই রাগভিত্তিক গান এবং বাজনা শুনলে খুব ভাল লাগে। দেহধারী প্রেতাত্মারাও না কী মালকৌশ শুনলে মুগ্ধ হন। প্রতিভাবান শিল্পী মালকৌশকে যে একটা অপার্থিব সৌন্দর্যদ্বারা মণ্ডিত করতে পারেন, তাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য গ্রন্থে এই রাগ সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত তথ্যই সযত্নে পরিবেশিত হয়েছে। বিবৃত হয়েছে রাগটির প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিবরণ (পৃ. ১-৩), নামকরণ ও জন্ম (পৃ. ৩-৫), ধ্যানমূর্তি (পৃ. ৫-৮) "স্বরসজ্জা" (পৃ. ৯-১৬), মালকৌশের পরিবার (পৃ. ১৬-৪৩)। সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী আছে ৪৪ পৃষ্ঠায়। ৪৫-৫২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে চারটি মালকৌশভিত্তিক গান এবং তাদের স্বরলিপি। শেষে আছে নির্বাচিত বিশিষ্ট শিল্পীদের মালকৌশ গানের ও বাজনার রেকর্ডের একটি মূল্যবান তালিকা। শিক্ষার্থীদের ও গবেষকদের কাজে লাগবে এই গ্রন্থ।

কতগুলো বিষয় কৌতুহলোদ্দীপক। ১৬ থেকে ৪৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মালকৌশ রাগের পরিবারের যে বিবরণ আছে, তা পড়ে মনে হয় যে, এক কালে সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় ফিউডাল রাজতন্ত্রের ভাবধারা দ্বারা সঙ্গীতচিন্তা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। মালকৌশ যেন এক রাজা। তিনি বহুপত্নীক। বহু পুত্র, তাঁদের বহু পত্নী, তাঁদের সকলের বন্ধু-বান্ধব-বান্ধবীর সংখ্যাও কম নয়। মালকৌশ যেন বহু শাখাপ্রশাখায় বিস্তারিত এক বিশাল বটবৃক্ষ। মালকৌশ যেন বাঙালি কুলীন ব্রাহ্মণদের তথাকথিত "বীজ পুরুষ"। সেই 'পুরুষ' থেকে শুরু হয়েছে কৌলীন্যের অপ্রতিহত জনস্রোত। 'ধ্যান'-এ সকলেরই অতি বিচিত্র রূপ বর্ণিত হয়েছে। রাধামোহন সেন রচিত 'সঙ্গীত তরঙ্গ' নামক গ্রন্থে এই রূপ বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক একটি অদ্ভুত কবিতা। "কুচকুম্ভ মাতঙ্গিনী মস্তকেতে ভাঙ্গ্যাছে", বা "পীন পয়োধর দেখি মাতঙ্গিনী রুষ্যাছে" প্রভৃতি পদে মালকৌশ অদৃশ্য এবং রসিকতাই সুস্পষ্ট। ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতের এই ধরনের তত্ত্বের যে কী যুক্তি ছিল এবং এই ধরনের যুক্তি থাকার দরকার ছিল কী না, এ প্রশ্নের উত্তর এই গ্রন্থে নেই। এ সব প্রশ্নও তোলা হয়নি। শিল্পী যেভাবে রাগের বা রাগিনীর রূপ প্রস্ফুটিত করেন, তার সঙ্গে ধ্যানের যে কী সম্পর্ক থাকে, তাও তো বোঝা

যায় না। হীরাবাই বরোদেকার, হাদ্দু খান, ওঁকারনাথ ঠাকুর এবং আবদুল করিম খান মালকৌশ গাইলেন। তাতে শ্রোতাদের ভাল লাগার অনুভূতিতে শাস্ত্রসম্মত ধ্যানরূপ পরিস্ফুট হয় কী? তা হওয়া সম্ভব? এ সব প্রশ্ন মনে জাগে। তাদের কোনও উত্তর পাই না। জন্মের আগেই কী নামকরণ হয়? আলোচনার একটি অংশের আখ্যা ঃ "নামকরণ ও জন্ম" (পৃ. ড-৫)। মার্গসঙ্গীতের তত্ত্বালোচনা একটু বৈচারিক হলেই ভাল হয়। সুপ্রাচীন কোন মুনি বা ঋষি যা বলেছেন, মধ্যকালীন কোন কোন সঙ্গীতবিষয়ক সন্দর্ভ রচয়িতা যা লিখেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রাগাধুনিক এসব সংজ্ঞার্থের, বিবরণের এবং আলোচনার বৈচারিক মূল্যায়নও কী প্রয়োজনীয় নয়?

রমাকান্ত চক্রবর্তী

দীপক দে সংকলিত। রাগ মালকৌশ। প্রকাশক রন্তিদেব মৈত্র। ৫০ টাকা।

ছাই-চাপা আগুনের কথকতা

কবিতা লিখতে লিখতে কবির মনেও বাছাইয়ের কাজ চলে। দীর্ঘ সময় ধরে যিনি কবিতায় সমর্পিত তাঁর পক্ষেও নির্বাচন জরুরি হয়ে পড়ে। অনেকটা ফিরে দেখার মতো। কবিতায় কোনো শেষ কথা নেই। একজন সৎ কবি গোটা কবিজীবন ধরেই কবিতায় উত্তরণে প্রয়াসী হন। বলা যাবে না কখন তাঁর ভাগ্যে জোটে সন্তুষ্টি। লিখে যাওয়াই তাঁর স্বেচ্ছানির্বাচিত কর্ম। নির্বাচিত কবিতা পাঠ করলে কবির সেই সৃজনকর্মের ক্যানভাসটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ধনঞ্জয় দাশের কবিজীবনের অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হল। এই অর্ধশতাব্দীর পথপরিক্রমায় তাঁর কবিতার শরীরে অনেক অভিজ্ঞতা প্রবেশ করেছে। সময়, সমাজ ও ইতিহাসের ধারার ত্রিস্রোত এই অভিজ্ঞতাকে পুষ্ট করেছে। চল্লিশের দশকে যে কবি ছিলেন নিতান্ত তরুণ, দুঃসাহসী ডাকাবুকো তাঁকেই দেখি কবিতার ভিতর দিয়ে ক্রমশ পরিণত হতে, সত্যদৃঢ় হতে। কবিতার নানা প্রকরণ ভেদ আছে। অনেকভাবেই কবিতা লেখা যায়। জীবন যেমন বহুমুখী এবং সৃজনবৈচিত্র্যে স্বপ্রকাশ কবিতাও তেমনি নানাভাবে নিজেকে তুলে ধরে পাঠকের কাছে। ধনঞ্জয় দাশের সমাজ ও সময়মনস্কতা বরাবর তাঁর কবিতাকে একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। একজন কবি তো সমাজবিলগ্ন কোনো সত্তা নয়। কবিতার সৃজনকর্মে জীবনের প্রতিভাস কীভাবে স্ফুরিত হবে তা নির্ধারণ করবে কবির শিল্পচেতনা এবং তাঁর বোধ। বস্তুত জীবনানন্দ কথিত এই

বোধ আসলে কবিসত্তার গভীরতার দ্যোতক। কীভাবে একজন কবির কলমে সেই শৈল্পিক গভীরতার দ্যোতনা মিলবে তা নির্ভর করবে কবির উপলব্ধি কোন আঙ্গিক ও শব্দনির্বাচনে শিল্পসৃষ্টির সহায়ক হবে।

এই প্রাক-কথন প্রয়োজন হল এই কারণে যে, ধনঞ্জয় দাশের কবিতার বিষয় ও গঠনপ্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে একটা সময়ের ইতিহাস যার প্রবহমান ধারা বাংলা কবিতার শিকড়ে জল দিয়েছে, তাকে আকাশ স্পর্শ করার স্পর্ধা জুগিয়েছে। এই কাব্যসংকলনের আদ্যোপান্ত তার চিহ্ন দেখতে পাই। মনে পড়ে যায় কীভাবে বাংলা কবিতা একটা বাঁক নিল চল্লিশের দশকে। তা হয়ে উঠল ইতিহাসের নতুন ভাষ্য। কবিতা হয়ে উঠল প্রতিবাদী। প্রতিরোধের ভাষা ফুটে উঠল নতুন প্রকরণগত সিদ্ধিতে। তারই পরম্পরায় ধনঞ্জয় দাশের মতো কবি ও তাঁর সহযাত্রীদের কবিতার পথচলা। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে পড়বে সেদিনকার অগ্রজ কবিদের। তিনি খুবই রাজনীতিমনস্ক কবি। এই রাজনীতি অবশ্যই শ্লোগানসর্বস্বতা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পৃথিবী জুড়ে যে উথালপাথাল ঘটনা, ফ্যাসিবাদের উত্থান ও পতন; পরবর্তীকালে স্নায়ুযুদ্ধের বিস্তার, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি তার সংকট ও সাময়িক পশ্চাদপসরণ, স্বাধীনতার দাবিতে পৃথিবীর দিকে দিকে ঔপনিবেশিক দেশের মানুষের বিপুল জাগরণ, আমাদের দেশের শ্রমিক-কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ বাঁচার সংগ্রাম—এই সব বোধ কবিতাকে উজ্জীবিত করেছে। ধনঞ্জয়ের কবিতায় তার অভ্রান্ত প্রতিফলন দেখি।

স্বপ্ন দেখার পরও থাকে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। কবিতার উপলব্ধিতে তার ছায়া পড়ে। বেদনাতুর কণ্ঠে তখন কবির কাছ থেকে আমরা শুনি বিষণ্ণ সংলাপ ঃ

> সময়ের ঠোঁটে হাসিগুলো অনেকদিন যেন মরে গেছে
> বড় ভয় করে আমার
> চোখের ছানিটা কেটে বাদ দিলে এখনো আমি দেখতে পাই
> ফুটপাত জুড়ে শুয়ে আছে চাপ চাপ রক্ত
> ছেঁড়া স্যাণ্ডেল, চটি আর নকশাপাড় কাপড়ের টুকরো
> বড় ভয় করে আমার। (স্বগতোক্তি)

কিন্তু এই ভয়ই শেষ কথা নয়। অনেক স্বপ্নের অপমৃত্যু হলেও কবির স্বপ্নদেখার আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রাণেও অনুরণন তোলে ঃ

> তোমরা বলে দাও
> সারা দেশটাকে দাঁতে ক'রে
> যে মত্ত বাঘিনী দিক্‌দিগন্ত ছুটে বেড়ায়
> আমি কবে তার পিঠে সওয়ার হব।

তোমরা বলে দাও
ঘৃণা আর পাপের ভস্মগুলো সরিয়ে ফেলে
আমি কবে দেখতে পাব
লাল আলোর মুকুট মাথায়
আমার বাংলার শিশিরধোয়া প্রসন্ন মুখ

(তোমরা বলে দাও)

এই নিরবচ্ছিন্ন আশা থেকেই একদিন ধনঞ্জয়ের কবিতার উদ্ভব। তার বেদনা ও হতাশার চিত্রও আমরা পাই তাঁরই কলমে। অনেক সময় আত্মসমালোচনারও মুখোমুখি হন তিনি। নিজের বিবেকের সামনে দাঁড়ানোর সততা না থাকলে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখা ভুল হয়ে যায়। ধনঞ্জয় যেখানে প্রখর সমালোচক সেখানেও তিনি প্রত্যয়ে স্থির। ভুলভ্রান্তির পরেও মানুষ তার মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছুবে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি 'শরসন্ধান' কবিতায় তিনি লিখতে পেরেছিলেন ঃ

আমি সূর্যের শরে রাত্রিকে বিদ্ধ করেছি
এসো আজ প্রভাতকে বন্দনা করি।
এসো, গ্রাম-বাংলার অজেয় ফেরারী সেনা
এখানে দাঁড়াও
এসো, বারুদ-ঠাসা প্রাণে আজ আমরা সারি বাঁধি।

(শরসন্ধান)

এই গভীর প্রত্যাশা নিয়ে যে কবির যাত্রা শুরু তার কণ্ঠে 'পঞ্চাশ বছর পরে' বেজে ওঠে বিষণ্ণতার সুর ঃ

পঞ্চাশ বছর পর সব স্বপ্ন স্মৃতিমাত্র
এই দ্যাখো, স্বপ্নের কঙ্কাল কোলে শুয়ে আছে সাধের মরাই।

(পঞ্চাশ বছর পরে)

বাস্তবিকই কি স্বপ্নের মৃত্যু হয়। একটি স্বপ্নের ভস্মশয্যা থেকে কি নতুন স্বপ্ন ডানা মেলে ওড়ে না? কবির কাজ তো সেই ডানাওয়ালা স্বপ্নকে মাটির কাছাকাছি এনে মানুষের আয়নায় মুখ দেখা। তিনিই তো শুনিয়েছিলেন

আমার বুকের গভীরে
কিছু ছাই চাপা আগুন
এখনও লুকিয়ে রেখেছি
তোমরা নেবে ভাই?

(ছাই-চাপা আগুন)

ধনঞ্জয় দাশের কবিতার এটাই হল মূল কথা। নতুন শতাব্দীতে সেই আলোকের দীপ্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে দেশে-বিদেশের সেই সব মানুষ, পল

রবসনের গানে যাদের বেদনা ও ক্ষোভকে ভাষা দেওয়া হয়েছিল এই ভাষায়ঃ 'তোমরা আমার স্বপ্নের গায়ে থুথু ছিটিয়েছিলে' (You spat on the face of my dreams)। সেই অপমানের হিসেব-নিকেশ তো এখনও হয়নি।

ধনঞ্জয় দাশ ও তাঁর সমকালীন সহযাত্রী কবিরা তো সেই হিসেব-নিকেশ করার জন্যই কবিতার রণাঙ্গনে ছুটে গিয়েছিলেন। এই রণক্ষেত্র থেকে তো পশ্চাদপসরণ নেই। বার্সিলোনা থেকে তেলেঙ্গানা-কাকদ্বীপ পর্যন্ত তার প্রসার। ওরা মাটিতে স্বপ্নের বীজ পুঁতে রেখে নিজেরা ইতিহাস হয়েছে। কবির তো স্বপ্নদেখার শেষ নেই। তাঁর পরাভব নেই। শিল্পের আগুন থেকে উঠে আসে সেই ফিনিক্স পাখি যার কাছে সত্য হল তার দুটি ডানা আর অসীম আকাশের নীলিমা বিস্তার। ধনঞ্জয় দাশ সেই স্বপ্নের শরিক হয়েই আরও কবিতা আমাদের উপহার দিন। যেহেতু এক প্রাতঃস্মরণীয় অগ্রজের কথা উদ্ধার করে প্রতিনিয়ত মন্ত্র জপি—কবি ছাড়া জয় বৃথা।

সুচারু প্রচ্ছদে ও সুমুদ্রণে নির্বাচিত কবিতা সংকলন পাঠককে তৃপ্তি দেবে।

কৃষ্ণধর

নির্বাচিত কবিতা। ধনঞ্জয় দাশ। নক্ষত্র প্রকাশন পি-১১৯, সি. আই. টি রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০। পরিবেশক ঃ প্রাইমা পাবলিকেশনস্‌; ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৭। দাম—তিরিশ টাকা।

মিহির আচার্যের গল্প

প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে মিহির আচার্য সাহিত্যের উঠোনে পা রাখেন। তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ 'নীল চোখ' প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। তার আগেই তাঁর লেখার জয়যাত্রা শুরু। জয়যাত্রা এই জন্য বলছি যে তখনকার শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় মিহির আচার্যের গল্প প্রকাশিত হতে থাকে—অরণি, পরিচয়, অগ্রণী, নতুন সাহিত্য, চতুষ্কোণ, পূর্বাশা প্রভৃতিতে। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি সাহিত্য শিল্পের প্রগতি আন্দোলনের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন, এমন কি শুকসারী নামে গল্পের একটি উৎকৃষ্ট পত্রিকা সম্পাদনা করেন দীর্ঘকাল। ১৯৪৫-৪৬ সাল কি তার কিছু আগে থেকেই তিনি নিয়মিত গল্প লিখতে শুরু করেন। ইদানীং অবশ্য তাঁর লেখা গল্প চোখে পড়ে না। তবে কি মিহিরবাবু-র লেখনী স্তব্ধ হয়ে গেছে, নাকি স্বেচ্ছায় লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। আলোচ্য 'মিহির আচার্যের গল্প সমগ্র' গ্রন্থটিতে ৪৬টি গল্প সংকলিত হয়েছে,

এ ছাড়া নিশ্চয়ই আরও কিছু অগ্রন্থিত গল্প আছে। মিহিরবাবু সংকলনটিতে নিজের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিকে স্থান দিয়েছেন, আর গল্পগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে প্রতিটি দশকের ছাপ তাঁর গল্পে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

'গল্প সমগ্র'-র প্রথম গল্প "সমুদ্র পাখি"। গল্পটির করণকৌশল অনবদ্য। ছোট ছোট অধ্যায়ে লেখা গল্পটি একটা জীবন সামগ্র্য তুলে ধরে যেন। রোমান্টিক গল্প সন্দেহ নেই, তবু গল্পটি পড়ার পর মন আপ্লুত হয়ে পড়ে।

প্রায় সব গল্পই মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক, মিহিরবাবু নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে চাননি কখনো, তবে শ্রমিক কৃষকদের সমস্যা ও জীবন নিয়েও গল্প লিখেছেন। বর্তমান সংকলনে মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক গল্পই বেশি স্থান পেয়েছে। মিহিরবাবুর গল্পে রাজনীতি স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েছে, কিন্তু তা গল্প রস সৃষ্টিতে কোনো ব্যাঘাত ঘটায় না, যেখানে রাজনীতি প্রায় সরাসরি এসে পড়ে সেখানেও নয়—'মা' ও 'শর্ত' গল্পটি তার সুন্দর উদাহরণ। "মা হওয়া একটা দায়িত্ব"—এই দায়িত্ব বোধ পালন করতে লেখক কখনোই পিছিয়ে পড়েননি। 'শর্ত' গল্পে ডাক্তার কুশারী চরিত্রটির বিকাশ ও পরিণতি আমাদের স্মরণযোগ্য।

মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে লেখা গল্পগুলির মধ্যে শহর জীবনের বাস্তবতা স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়ে, এর মধ্যে "হিংস্রতা বর্জন করুন" গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নিম্ন মধ্যবিত্তের তীব্র সংকট শেষমেশ বিদ্রোহী হয়েও ব্যক্তি সন্ত্রাসের রাস্তা বেছে নেয়—মিনুর পরিণতি তে তা-ই স্পষ্ট হ ওঠে। 'গল্প সমগ্র'র মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী গল্প হচ্ছে "কলকাতা, কলকাতা" পর্যায়ের ছয়টি গল্প। চারটি গল্পকে একসঙ্গে বিচার করলে একে ছোট উপন্যাসই বলা যেতে পারে।

গল্পগুলির শেষে রচনাকাল উল্লিখিত থাকলে গল্পকারের বিকাশের রেখাটি আমরা স্পষ্টভাবে ধরতে পারতাম। তা না থাকলেও আমরা বুঝতে পারি, মিহিরবাবুর গল্পের মূল কেন্দ্রটি হচ্ছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা। লেখক রাজনৈতিক সচেতন হলেও গল্পগুলিতে সরকারী আশাবাদ ফুটিয়ে যান্ত্রিক করে তোলেন নি, আর তা করেননি বলেই তিনি গল্পর করণ-কৌশল নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করতে বিমুখ হননি। প্রথমেই মনে পড়ে "পূর্বমেঘ উত্তর মেঘ" গল্পটির কথা—কালিদাসের মেঘদূতের মত পূর্ব ও উত্তর মেঘ—দুইপর্বে গল্পটি ভাগ করে প্রধানত সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন বিরহের ছবি নয়, এক নির্মম বাস্তব ছবি। তেমনভাবে অন্য এক রীতি গ্রহণ করেন "সাধু-চোর সংবাদ" গল্পটিতে।

'মিহির আচার্যের গল্প সমগ্র' পড়তে পড়তে অবাক হয়ে ভাবতে হয়—এই দক্ষ ক্ষমতাবান উল্লেখযোগ্য লেখক গল্পের জগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন

নিলেন কেন? আমরা কি আশা করবো না, তিনি আবার গল্প লিখতে শুরু করবেন? উপহার দেবেন মহার্ঘ গল্প বাংলা সাহিত্যে।

কার্তিক লাহিড়ী

মিহির আচার্যের গল্প সমগ্র। মিহির আচার্য। লেখক সমাবেশ। ১৫০ টাকা।

বই আর বই

গল্প যখন জীবন এবং জীবন যখন গল্প

সমাজ-বাস্তবতার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যাঁদের কলম দর্পণের মতো কঠিন সত্যকে প্রকাশ করতে পারে, সঞ্জীবন চট্টোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। বস্তুতপক্ষে তাঁর গল্প-সঙ্কলন 'অ্যানিম্যাল সাফারি' আমাদের চারপাশের যত কিছু গ্লানি-কুশ্রীতা-মালিন্য সেগুলিকে যেমন একের পর এক তুলে এনেছে, তেমনি সেইসব মানুষদের কথাও বলেছে, যাদের জন্য এ পৃথিবীর সত্য, সুন্দর, মঙ্গল আজও ফুরিয়ে যেতে পারেনি।

'সোসাইটি, যুগল এবং পুলিশভ্যান' গল্পের যুগল সেই সত্যের প্রতীক। রাজনৈতিক জটিল নিয়মে গ্রামের মানুষদের জন্য, তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সোসাইটিও হয়ে যায় ক্ষমতাসীনদেরই একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান। তাই অনায়াসেই ড্রেন তৈরী হয় বীজরোপনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া জমির উপর দিয়ে—যার মালিক যুগল। প্রতিবাদে আকাশ ফাটায় যুগল এবং পরিণামে তাকে উঠতে হয় পুলিশ ভ্যানে। আর এরপরই গল্পকার সেই অমোঘ অনুভবের কাছে পাঠককে এনে দাঁড় করিয়ে দেন—"পৃথিবী ঘোরে। ধীরে ধীরে। ভ্যান গড়ায়। এলিয়ে থাকতে চায় না যুগলের বেড়ি পরানো হাতদুটো। চোখে দেখে ভ্যানেও চারটে দেয়াল, মাথায় একটা। পরিষ্কার দেখতে পায়—মাঠ, ঘর, পথ, সোসাইটি। একই রকম।"

'অ্যানিমাল সাফারি' গল্পটি তো নামকরণ থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত পাঠককে এক বোবা যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। গ্রন্থের ভূমিকায় শুভঙ্কর ঘোষ এ গল্প সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন—"তাঁর অ্যানিম্যাল সাফারি আরণ্যক প্রাণী ও মনুষ্যসমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ে উভয়ের অবস্থানকে পাল্টাপাল্টি করে নেয়; চারপাশে হিংস্র প্রাণী, খাঁচায় বদ্ধ মানুষের অবস্থায় তিনি চিন্তিত থাকেন।' এই সমাজে মনুষ্যত্বের সঠিক সংজ্ঞায় চিহ্নিত হতে পারে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় মানুষ, তাদের টিকে থাকা যে সত্যই দুষ্কর

হয়েছে অগণিত মানুষ নামধারী পশুদের ভিড়ে—একথা আজ আর অস্বীকারের নয়। তাই দুষ্কর্মের সাক্ষী বলে সাত বছরের শিশুকেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকতে হয় রাতের অন্ধকারে। সুতীক্ষ্ণ সমাজ দর্শনের নিখুঁত এই ছবি পাঠককে স্তব্ধ করে দেয়।

'বিশের জীবনকথা' শ্রমজীবি মানুষের দৈহিক শ্রমের সঙ্গে যান্ত্রিক সভ্যতার যন্ত্রচালিত ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় অনিবার্যভাবেই শ্রমিক বিশের পরাজয়ের কাহিনী।

'মই' গল্পটি সামান্য ব্যঙ্গমিশ্রিত শব্দপঞ্জীতে রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থান্ধতার নগ্ন ছবিটি প্রকাশ করেছে। সমগ্র গল্পের মূল বক্তব্য একটি পংক্তিতেই বিন্যস্ত হয়ে যায়, যখন গল্পকারের কলম থেকে বেরিয়ে আসে চমকে দেওয়ার মতো এই পংক্তি—'মইয়ের কাঁধে মানুষ উঠবে। তা না মানুষের কাঁধে মই চড়েছে।'

'লক্ষ্মী ওঁরাও' এবং 'ফট্‌কে পাগল' দুটি গল্পই সমাপ্তিতে মাটির কাছাকাছি থাকা খেটে খাওয়া মানুষগুলির একত্র সম্মিলিত হয়ে আগ্রাসী শোষক শক্তির বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। লক্ষ্মী এবং ফটিক—দুটি চরিত্রই তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে একক প্রতিবাদে সোচ্চার হতে চায়। তাদেরই সমগোত্রীয়, একইভাবে বঞ্চিত, শোষিত অন্য মানুষেরা প্রথমে তাদের সঙ্গে জোট বাঁধতে ভয় পায়, কিন্তু সেটাই যে শেষ কথা নয়, গল্পকারের মূল বক্তব্য সেটাই।

'কালিদাসের প্রথম ভাগ'—এই সময়ের প্রত্যন্ত গ্রামের শোষিত, বঞ্চিত মানুষের ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। শ্যাম রাজবংশীর বঞ্চনাকে শত চেষ্টাতেও প্রতিরোধ করতে পারেন না অশীতিপর গোবর্ধনবাবু। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র সুজিত শ্যামের জমির জবরদখল ঠেকাতে গিয়ে প্রাণ দেয়। নিরক্ষর রাজবংশীদের প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠতে চাওয়া সমস্ত সুচেতনার যে এমন করেই অপমৃত্যু ঘটে—গল্পকার সেই ইঙ্গিতেই এই গল্পের সমাপ্তিরেখা আঁকেন।

সমগ্র গল্পগ্রন্থটির পাঠ এমন এক অনুভূতিতে পৌঁছে দেয় পাঠককে, যেখানে আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই নিজেদের ঘৃণ্য স্থবিরতা দেখে। আবার কোথাও দেখি, মার খেতে খেতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষগুলি একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। বোঝা যায়, গল্পকার সত্যিই অনুপ্রাণিত 'এই কবন্ধ অন্ধকার সময়েও অনেক ভালো মানুষ, একদল সবুজ প্রাণ আর প্রকৃতির কাছে।' শ্যামলবরণ সাহা-র প্রচ্ছদও প্রশংসার দাবী রাখে।

সুব্রতকুমার রুদ্র রচিত গল্পগ্রন্থ 'আরশিনগরের রূপকথা'-র প্রচ্ছদসহ অধিকাংশ গল্পই এক প্রতীকি তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে পাঠককে ভাবায় অনিবার্যভাবেই। আমরা, এই যান্ত্রিক যুগের মানুষেরা সকলেই যে এক অর্থে 'আরশিনগরের পড়শী', সেই কথাটিই গল্পকার তুলে এনেছেন্ প্রায় প্রতিটি গল্পেই। সূচিপত্রে গ্রন্থটির ১২টি গল্পের প্রথম ৮টি গল্পকে 'কাচমানুষদের কথা' এবং পরবর্তী ৪টি গল্পকে 'আরশিনগরের পড়শীকথা' শীর্ষনামের অন্তর্ভুক্ত করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তবে কয়েকটি গল্প যেমন—'পঙ্গজ', 'দেওলা', 'স্বপ্নপ্লেগ', 'বাথরুম' ইত্যাদি, কিছুটা দুর্বোধ্যতায় আক্রান্ত হয়ে পাঠককে গল্পরসের মায়াময় সম্মোহনের কাছাকাছি হয়তো খুব সহজে পৌঁছে দিতে পারবে না। 'আট কুঠুরি নয় দরজা' গল্পের প্রায় যতিচিহ্নহীন বিন্যাসে পাঠক বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। এ জাতীয় শৈলী কি গল্পকার পরীক্ষামূলকভাবেই ব্যবহার করলেন? এর মাধ্যমে তিনি কোন্ ভাবনাকে প্রতিফলিত করতে চাইলেন, তা কিন্তু স্পষ্ট নয়। তাঁর 'গল্পের সন্ধানে', 'নীল সময়', 'সাঁকো' ইত্যাদি গল্পে গল্পকারের গল্পবয়নের দক্ষতাকে চিনে নেওয়া যায়।

'আরশিনগরের পড়শীকথা' শীর্ষনামে বিন্যস্ত একাধিক গল্পের মধ্যে আভাসিত হয় 'তরাইকান্দি' নামক এক অত্যন্ত গ্রামের মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষগুলির কথা। কিন্তু 'রূপকথা' যদি 'রূপকে' পর্যবসিত হয়ে যায়, তখন গল্পরস যে ব্যাহত হতে বাধ্য, সে ব্যাপারে লেখক যদি একটু সচেতন হতেন, তাহলে এ গ্রন্থের সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকত না।

পিয়ালি দে

অ্যানিম্যাল সাফারি। সঞ্জীবন চট্টোপাধ্যায়। দিবারাত্রির কাব্য। ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলি-১২। দাম—৪০্।

আরশিনগরের রূপকথা। সুব্রতকুমার রুদ্র। জললিপি। রমণী রোড নং ২, করিমগঞ্জ, আসাম ৭৮৮৭১০। ৩০্

এই সময়ের কিছু কবিতা

শ্রীঅজিত বসুর 'শূন্য হিরন্ময় চূর্ণ' কাব্যগ্রন্থে সমসময়-এর ছবি উঠে আসে। দলিত মানুষের লাঞ্ছনা, শোষণ যেমন সেখানে ঠাঁই পায়, তেমনি তথাকথিত এই 'গতিময়' যুগের মূল যে স্থবিরতা তার উল্লেখও করেন কবি। 'আলো' শব্দের বারংবার ব্যবহারে কোন কবিতা হয়তো শুদ্ধতার জন্য অপেক্ষা করে থাকে, আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে 'মূর্তি' শব্দটি উঠে আসে

একাধিক কবিতায়। শীর্ষনামে 'অগ্নিমূর্তি', 'আত্মমূর্তি', 'হৃতমূর্তি', 'সত্যমূর্তি', 'ভাবমূর্তি' ইত্যাদি বর্ণমালার প্রয়োগ বুঝিয়ে দেয় কবির অপেক্ষা এবং বিশ্বাস এটাই, সত্যতা, শুদ্ধতা আর আলোকময়তাতেই মানুষের অন্তিম এবং অনিবার্য স্থিতি।

শ্রীকেতকীপ্রসাদ রায়-এর 'দ্রৌপদীর জন্য কত স্পনসর' কাব্যগ্রন্থটিতে সহজ ভাষায় মাতৃভূমির প্রতি কবি তাঁর আন্তরিক আবেগের প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রিয় স্বদেশের প্রাত্যহিক অবক্ষয় আর দেশবাসীর জীবনচারণের বিকৃতি যে যন্ত্রণায় কবিকে পৌঁছে দেয়, সেখান থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছেই ফিরতে হয় কবিকে— 'আমার অস্তিত্বের ঠিকানার অন্বেষণে, /বার বার চলে যাই মানুষের কাছে' (মানুষ)। শব্দচয়ন বা চিত্রকল্পে আরও একটু অনুশীলনের অপেক্ষা থেকে যায়।

প্রবীণ কবি সৌরীন গুহ তাঁর 'নিবাস কলকাতা' কাব্যগ্রন্থে কিছুটা বক্রদৃষ্টিতে তাঁর চারপাশের পরিবেশ, সামাজিক দুর্নীতি, অবক্ষয়, নেতৃস্থানীয়দের সুযোগসন্ধানী ভূমিকা—এসব কিছু সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য করেছেন। কবিতাগুলির বাস্তবতায় কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকা সত্ত্বেও বলতেই হয় যে, কবি কোন কোন কবিতায় আক্রমণের লক্ষ্যে যখন ব্যক্তিবিশেষের নাম তুলে আনেন, তখন সেইসব রচনা 'কবিতা' হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোথায় যেন ধাক্কা খায়। শব্দচয়নে বা বর্ণমালার বিন্যাসে সাংবাদিকতাধর্মী মনোভঙ্গি 'সাহিত্য'-এর কাছাকাছি পৌঁছতে পারে কি? তবে দলিত মানুষের লাঞ্ছনা বা শোষণের কথা বলেন যেসব কবিতায় তার কয়েকটি সত্যিই অসামান্য হয়ে ওঠে কবির শৈলী এবং আন্তরিকতায়। এক সুন্দর, মায়াময় কলকাতা-র স্বপ্ন কবির চোখে থাকে, যেখানে আছে—'গাছ-গাছালির পাখা, / নিকোনো উঠোন, / পেঁজা তুলোর বালিশ, / উদ্বেগহীন সুস্থ জীবন।' (ইচ্ছে হয়)।

কবি অনির্বাণ দত্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'যে যার সুন্দর'-কে দুটি পৃথক বিভাগে বিন্যস্ত করেছেন—'শস্য হও বীজ' এবং 'নড়ে ওঠো, আগ্নেয়গিরি'। কবির রোমান্টিক মনন, তাঁর অনুভব হৃদয়ের গহন থেকে তুলে আনে চিরন্তন সেই উপলব্ধিকে, যা ছড়িয়ে থাকে 'স্পর্শমণি', 'ক্ষত', 'প্রতিবিম্ব', 'তুমি' ইত্যাদি কবিতায়। কোথাও তাঁর সহজ সমর্পণ—'আজন্ম প্রেম, তোমায় ছুঁতে—আমৃত্যু হাত বাড়িয়ে আছি' (স্পর্শমণি), আবার কোথাও এই অধরা ভালবাসাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন—'নদীতে ছিল সেদিন সারস, দুটি... / আজকে কেবল একটি বেড়ায় ঘুরে।' (প্রতিবিম্ব)

কবির সমাজ-সচেতনতা রূপ পায় কখনও ঝলসে ওঠা তীব্র বিদ্রূপে,

কখনও বা স্পষ্ট, দৃঢ়, ঋজুরেখ শব্দবন্ধে। ১৯৯৭-এর ১৬ মে এবং ১৭ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত দুই সংবাদের ভিত্তিতে লেখা 'দান' কবিতাটি এই সময়ের সঠিক প্রতিফলন। বিপণন জগত, অসংখ্য চ্যানেলের অবোধ্য 'সংস্কৃতি'-র বেড়াজালে ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া শিশুমন—সব কিছুরই টুকরো টুকরো বাস্তব ছবি ছড়িয়ে থাকে অনির্বাণের বর্ণমালায়। শিশুশ্রমিকদের প্রতি অনির্বাণের আন্তরিকতা তাঁর নিজস্ব স্বীকারোক্তিতেই স্পষ্ট—

'ওদের কথাই ভাবছি ভীষণ, ওদের কথাই লিখব বলে...
গুছিয়ে দিতে কাগজ-কলম
ডাকছি খুদে বাচ্চাটাকে—
পাপান নামের যে ছেলেটা আমাদেরই বাসায় থাকে।' (পথকলি)

এমন করেই তো কবিরা শেখাবেন আত্মমূল্যায়ন করতে। অনির্বাণ তাঁর শক্তিশালী লেখনীর প্রয়োগে প্রকাশ করুন এমন আরও কবিতা—সেই শুভেচ্ছ রইল।

কবি তপনকুমার মাইতি-র কাব্যগ্রন্থ 'ও বিষাদ আমার দিকে তাকাও' অনুভববেদ্য শব্দপঞ্জী নিয়ে পাঠককে ছুঁয়ে যেতে সক্ষম। প্রেম-অপ্রেম, আশা-নিরাশা, সমসময়—এসব কিছুর পাশাপাশি দুটি কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি কবির শ্রদ্ধা নিবেদন পাঠককে উপহার দেয় কিছু অনুপম বর্ণমালা। কবি অজিত বাইরীকে নিবেদিত কবিতাটি কবির বিশ্বাসের কেন্দ্রটিকে চিনিয়ে দিতে পারে সহজেই, যখন তিনি উচ্চারণ করেন—'একজন কবির শ্রেষ্ঠ অহঙ্কার / তার মনুষ্যত্ব।' (কবি)

'মুহূর্তের মর্মর' শীর্ষক কবিতামালার পরিবেশনা সুন্দর। তবে কোন কোন নিছক মন্তব্যনির্ভর কবিতার প্রকাশ নিয়ে কবি ভবিষ্যতে সচেতন হলে ভালো হবে বলে মনে হয়। কারণ, তখনই কবি তাঁর জীবন-সম্পৃক্ত চেতনায় পাঠকের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে চিরন্তনের সম্মান পেয়ে যাবেন। তাঁর মরমী লেখনীর জন্য শুভকামনা রইল।

পিয়ালি দে

শূন্য হিরন্ময় চূর্ণ। অজিত বসু। পত্রপুট। ৩৭/৯, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯। দাম—২৫্।

দ্রৌপদীর জন্য কত স্পনসর। কেতকীপ্রসাদ রায়। প্রমা প্রকাশনী। ৫, ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলি-১৭, ৫৭/২ই কলেজ স্ট্রিট, কলি-৭৩। দাম—২৫্।

নিবাস কলকাতা। সৌরীন গুহ। আভাঁগার্দ প্রেস। ৪৭, টালিগঞ্জ রোড কলি-২৬। দাম—২০।

যে যার সুন্দর। অনির্বাণ দত্ত। গণমন প্রকাশন। ৩৩এ/১এ হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কলি-৫০। দাম—৩০।

ও বিষাদ, আমার দিকে তাকাও। তপনকুমার মাইতি। প্রতিমুখ। ৩২/৭/২, আন্দুল ১ম বাই লেন, হাওড়া-৭১১১০৯। দাম—২৫।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালপঞ্জী

সর্বসাধারণের জন্য লেখা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালপঞ্জী বইটিতে যেমন ১৭৫৭—১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে, তেমনি রয়েছে ভারতের গভর্ণর জেনারেল ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি ও অধিবেশনের স্থান তালিকা। এরই সঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনাপঞ্জী, ১৭৮০—১৯৪৭ ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, মারাঠী ভাষার পত্রিকাপঞ্জী, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কালপঞ্জী। বাংলা পত্রপত্রিকা প্রকাশনাপঞ্জী (১৮১৮—১৮৭০), ব্রিটিশ ভারতে বাজেয়াপ্ত পুস্তক তালিকা এবং মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু তারিখ সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটি প্রামাণ্য রেফারেন্স হয়েছে।

গ্রন্থকার সাংবাদিকতায় ডক্টরেট। তিনি ডাকটিকিট, মুদ্রা সংগ্রহ বিষয়ে অনুশীলন ও অধ্যয়নকারী গবেষক-বিশেষজ্ঞ।

অধ্যাপক ড্ক লাড়্লিমোহন রায়চৌধুরী গ্রন্থটির মুখবন্ধকার। মুখবন্ধটি বইটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

দুলাল ঘোষ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালপঞ্জী। প্রবীরকুমার লাহা। নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ, ৬৮, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩। ৫০ টাকা।

কল্যাণ দত্তঃ স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট

'আমার কমিউনিস্ট জীবন' এমন এক বিরল প্রজাতির কমিউনিস্টের আত্মকথা, যার মধ্যে বিশ শতকে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পাঁচ দশকের একটা অসাধারণ মূল্যায়ণ পাওয়া যায়। গ্রন্থের শিরোনাম বুঝিয়ে দেয় লেখক প্রচলিত অর্থে তাঁর জীবনকথা বলছেন না। তিনি বলেছেন তাঁর কমিউনিস্ট জীবনের কথা। অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে অশক্ত শরীরে জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি যে জীবনকথা বলেছেন সেখানে প্রতিটি ছত্রে রয়েছে পঞ্চাশ বছর-ব্যাপী কমিউনিস্ট জীবনের অকপট বিবৃতি, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। এই আত্মকথনের কথাকার অল্পকাল আগে প্রয়াত কল্যাণ দত্ত।

কল্যাণ দত্ত'র কমিউনিস্ট জীবনকথা পড়লেই বোঝা যায় শেষ বয়সে রাজনৈতিক সক্রিয়তা যখন ক্রমে থেমে গিয়েছে, তখনই এই রচনার সূত্রপাত। এটা কোন রোজনামচা নয়। লেখকের রোজনামচা লেখার অভ্যাস ছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু তাঁর কমিউনিস্ট জীবনের অভিজ্ঞতার কোন বড়ো মাপের ঘটনা, যা তাঁর সমকালকে এবং তাঁকেও নাড়া দিয়েছিল, তার কিছুই তিনি বাদ দেননি। সেখানে কেবল ঘটনার বর্ণনা নয়, সেই সব ঘটনায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মতামত, অবস্থান, আর সেই সবের প্রতিক্রিয়ায় লেখকের তখনকার মত এবং পরবর্তী বিচার বিশ্লেষণ তিনি অকপটে বর্ণনা করেছেন। কারো মন যুগিয়ে কথা বলা, নিজের ভুল ভ্রান্তি জেদের কথা তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন। আর ঠিক এই কারণেই তিনি অন্য ধাতুর অন্য মাপের কমিউনিস্ট, যাঁরা সত্যিই বিরল প্রজাতি।

কমিউনিস্ট জীবনের অন্যতম প্রধান গুণ হলো আত্মসমীক্ষা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা। আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো কমিউনিস্টরাও আত্মসমীক্ষা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনায় নিজের কথা যতোটুকু বলে সেখানে অন্যদের দোষক্রুটির কথা সবিস্তারে উল্লেখ করে নিজের ভুল ভ্রান্তিকে চলতি পরিস্থিতির জন্যে ঘটেছে বলেই উল্লেখ করে। উদ্দেশ্য তার একটাই, নিজেকে বাঁচিয়ে চলা। কল্যাণ দত্ত সেকাজ কোথাও করেন নি। নিজের ভুল ভ্রান্তির দায় অসামান্য সততায় উল্লেখ করতে পেরেছেন বলেই, অন্যদের সমালোচনাও অসংকোচে করতে পেরেছেন। ফলে তাঁর সমালোচনা বর্শার ফলার মতো অন্যকে বিঁধলেও, সেখানে ব্যক্তিগত আক্রমণ নেই, নেই কোন কথার উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার। এই রাজ্যে অবিভক্ত এবং বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতারা, যেমন প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ি, বিশ্বনাথ মুখার্জি যাঁরা সবাই প্রয়াত,

এবং জীবিতদের মধ্যে হীরেন মুখার্জি ও জ্যোতি বসুর দীর্ঘ কমিউনিস্ট জীবনে পার্টির কাজ ও গণআন্দোলন পরিচালনায় কোথায় তাঁরা রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য সমাজ বিপ্লবের পথ থেকে সরে তাৎক্ষণিক লাভ বা অলাভের ভাবনায় কাজ করেছিলেন কিম্বা সেই ধরণের কাজ সমর্থন করেছিলেন, লেখক তার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও বলেছেন, তিনি নিজে অন্ততঃ কয়েকবার নেতৃত্বের এই সব বক্তব্য সঠিক বলে মেনেই কাজ করেছিলেন। সেটা যে ভুল তা পরে বোঝা গিয়েছে। কিন্তু নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত কিম্বা সমস্টিগত ভাবে আত্মসমালোচনা করে কোথায় কেন ভুল হয়ে গেছে, তা কখনো বলা হয়নি। আত্মসমালোচনার নামে ব্যর্থতার দায় অন্যদের উপর চাপানো হয়েছে, কিম্বা নিয়মরক্ষা করে আত্মসমালোচনা করা হয়েছে। আত্মসমালোচনা যে সমাজবিজ্ঞান হিসেবে সার্থক ভাবে মার্ক্সবাদ প্রয়োগ করার হাতিয়ার, সেই ধারণা এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে বহুকাল কোন স্বীকৃতি পায়নি।

কল্যাণ দত্ত তাঁর কমিউনিস্ট জীবনে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার হাতিয়ার যেখানে সম্ভব, যতোটা সম্ভব নির্দ্বিধায় প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। আসলে দেশে বিশ, তিরিশের দশকে যাঁরা কমিউনিস্ট হয়েছিলেন, তাঁদের মানসিক গঠনে শোষণ মুক্তি, শ্রেণীহীন সমাজ, বিপ্লব, নতুন সমাজের ধারণা, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলির বৌদ্ধিক আবেদনের চেয়ে আবেগের আবেদন ছিল অনেক বেশি জোরালো। মার্ক্সবাদের প্রথম পাঠ নেওয়ার সুযোগ তাঁদের অনেকেরই প্রথম জীবনে আসেনি। মার্ক্সবাদ ছিল শোনা কথা, বড়োজোর তার অ আ ক খ সম্পর্কে নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের পরিচয়। আন্দামান বন্দিশিবিরে মার্ক্সবাদের কিছু চর্চার সুযোগ কারো কারো হয়েছিল। সেইটুকু তত্ত্বজ্ঞানের পুঁজি নিয়ে ভারতের মতো অত্যন্ত জটিল দেশ ও সমাজের সমস্যা খুঁটিয়ে বিচার করার ক্ষমতা, দক্ষতা যে তাঁদের ছিল না, সেকথা বলা বোধ হয় ভুল হবে না। এমন কি চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কল্যাণ দত্ত'র মতো কমিউনিস্ট হয়েছিলেন তাঁরাও যে মার্ক্স লেনিন, স্তালিনের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী অনুশীলন করে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, সেকথা বলা যাবে না। কল্যাণ দত্ত নিজেই বলেছেন ল্যাস্কি প্রমুখ র‍্যাডিচাল চিন্তার ইংরাজ তাত্ত্বিকদের গ্রন্থ থেকেই তাঁদের মার্ক্সবাদে দীক্ষা হয়। সেই তাত্ত্বিক ধারণার মর্মবস্তু উপলব্ধি করতে, অর্থাৎ তত্ত্বকে প্রয়োগ করার দিকটির গভীরে প্রবেশ করতেই তাঁদের কমিউনিস্ট হওয়া। অনুমান করা যায়, এই ধরণের কমিউনিস্ট যিনি বৌদ্ধিক বিচারকে সব সময়ে প্রাধান্য দেবেন, সেখানে যে কোন ব্যর্থতা বা সাফল্যের ব্যাখ্যা, অর্থাৎ আলোচনা, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার প্রক্রিয়াটি সব সময়ে চলতেই থাকে। ফলে পরিস্থিতির

দাবিতে চান কিছু তখনকার মতো মেনে নিলে বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের তাগিদ তখনকার মতো চাপা পড়তে পারে, কিন্তু শেষ হয় না। আর শেষ হয় নি বলেই জীবনকথায় বিভিন্ন পর্বের আন্দোলনের আলোচনায় কমিউনিস্টদের সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যমাত্রা, কিভাবে দলীয়, অনেক সময় উপদলীয় কারণে চাপা পড়ে যায়, তার কথাও বলেছেন। দলের সমর্থন, কিছু ভোট বেশি পাওয়া, কয়েকজন প্রার্থী বেশি নির্বাচিত হওয়া, অথবা উপদলীয় কারণে কোন এলাকায় কোন নেতা বা গোষ্ঠীর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়েছিল ঠিকই কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলন তার জন্যে এগোয় নি, বরং পিছিয়ে পড়েছিল।

শ্রমিক আন্দোলনে এই ধরণের সীমিত স্বার্থের অনুকরণ কতোটা ক্ষতিকর হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় শুধু এই রাজ্যে নয়, সারা ভারতে শ্রমিক আন্দোলনে বিশেষতঃ সংগঠিত ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের বিলীয়মান প্রভাব। প্রতিদ্বন্দ্বি শ্রমিক সংগঠনগুলি শ্রমিক শ্রেণীকে ধর্ম, জাতপাত, প্রাদেশিকতা, ভাষা কিম্বা আঞ্চলিকতার জিগিরে বহুধা বিভক্ত করে নিজেদের বিরাট প্রভাবের এলাকা গড়ে তুলেছে। কিষাণ সভার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কৃষক সমাজের কোন অংশকে সঙ্গে নিয়ে কাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, সেই বিষয়ে কমিউনিস্টদের চিন্তার স্বচ্ছতা ছিল না। ফলে আন্দোলন হয়েছে ইস্যুভিত্তিক, তার সাফল্য কমিউনিস্ট আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

কল্যাণ দত্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্যমাত্রা যে সমাজ বিপ্লব, তার প্রতি একনিষ্ঠ থাকাকেই কমিউনিস্টদের কাজ বলে ভেবেছিলেন। সে কাজে ভাটার টান স্বাধীনতা উত্তর কালেই লাগতে থাকে। পঞ্চাশের দশকের শেষ আর ষাটের দশকের গোড়ায় সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলেই, কমিউনিস্ট পার্টি যখন ভাগ হয়ে গেল, সেখানে বিপ্লবের স্তর নিয়ে তর্ক তাঁর কাছে নিতান্ত মেকী বলে মনে হয়েছে। দেশের অন্যরাজ্যে যেখানে বামপন্থী আন্দোলন শৈশব অতিক্রম করতে পারে নি, সেখানে এই বিতর্ক ছিল আরো অর্থহীন। তাই বিপ্লব 'জাতীয় গণতান্ত্রিক' অথবা 'জনগণতান্ত্রিক' হবে বলে যাঁরা তর্ক করেছেন, তাঁদের তখন খেয়ালই হয়নি বিপ্লব যাদের নিয়ে করা হবে দেশের বিকাশমান পরিস্থিতি তাদের কমিউনিস্টদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। সেই ধারা, এই একুশ শতকের গোড়ায় এমনই জোরালো যে এখনকার কমিউনিস্ট আন্দোলন আর নিয়মরক্ষা করার ক্ষমতাও কমিউনিস্টরা হারিয়েছে। তাদের কিছু ফ্রন্ট অবশ্যই মাঝে মাঝে আন্দোলন করে, কিন্তু 'দিতে হবে' কিম্বা 'ছাড়তে হবে', এই দুই শ্লোগানের বাইরে আর যেতে পারে না। আর এইটুকু করতে হয় এই জন্যে যে না

হলে নিজের 'কমিউনিস্ট' পরিচয় মুছে যাবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের কমিউনিস্টরা ছিলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রথম যুগের মানুষদের মতো দেশব্রতী। কমিউনিস্টরা কেবল দেশপ্রেমে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন নি, জেনে বুঝে, কিম্বা অস্পষ্টভাবে হলেও তাঁরা শোষণ মুক্তির আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের মানসিক যোগ অনুভব করতেন। নিজের জীবনে দেশের মুক্তি কিম্বা সামাজিক শোষণমুক্তি দেখে যেতে পারবেন, তাঁদের অধিকাংশের সেই আশা ছিল না। কোন প্রাপ্তিযোগের জন্যে দেশব্রতী হন নি। কিন্তু স্বাধীনতার পর যতোদিন গেছে, ততোই ছবিটা বদলে গেছে। ক্ষমতায় আসতে পারা, কিম্বা ক্ষমতাসীনদের কাছাকাছি আসতে পারা, এটাই লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে বেড়েছে প্রভাব, প্রতিপত্তি। আর এই প্রক্রিয়া বিগত দুই তিন দশকে যতোই শক্তিশালী হয়েছে, ততোই কমিউনিস্ট আন্দোলন স্তিমিত হতে হতে তার প্রাণশক্তি হারিয়েছে। কেন এমন হলো; কমিউনিস্ট নেতৃত্ব, কল্যাণ দত্ত সি পি আই এবং সি পি আই (এম) দুই পার্টি প্রসঙ্গেই বলেছেন, তার কোন মূল্যায়ন কোনদিনই করে নি। হয়তো বা তার কারণ ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, লেনিনের পার্টি, সোভিয়েত পার্টির আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের মধ্যে নিহিত।

প্রথম যুগের কমিউনিস্টদের কাছে দুনিয়ার একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে মডেল মনে করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। চল্লিশের দশকে যাঁরা কমিউনিস্ট হয়েছিলেন তাঁদের সামনেও ছিল ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে বিজয়ী, বিপুল রক্তের মূল্যে সমাজতন্ত্রের অপরাজেয় প্রাণশক্তির প্রমাণ স্বরূপ সোভিয়েত ব্যবস্থার আদর্শ। কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিকতাবাদ সোভিয়েতের এই মহান দৃষ্টান্তের সামনে দাঁড়িয়ে তাকেই যে মডেল হিসেবে গ্রহণ করবে; তার মধ্যেও কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। কিন্তু দেশের যে বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়তে হয়, সোভিয়েতের নকল-নবিশি করে যে সেকাজ সম্ভব নয়, সাধারণ কমিউনিস্টরা না বুঝলেও, যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন তাঁরা কেন বোঝেন নি, বোঝার চেষ্টাও করেন নি, কল্যাণ দত্ত সেকথাই বার বার বলেছেন। জীবনে প্রথমবার সোভিয়েত দেশে গিয়ে সেই ১৯৫৪/৫৫ সালেই কল্যাণ দত্ত প্রমুখ কিছু তরুণ কমিউনিস্টের মনে হয়েছিল, সেই দেশে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁক, ফাঁকি থেকে যাচ্ছে যা তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধনে স্বাভাবিকতা হারাচ্ছে। এরপর আরো যে তিনবার তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছেন পরবর্তী বিশ বছরে, সেখানে এই ফাঁকটুকু আরো বড়ো হতেই দেখেছেন, তা ভরাট হতে দেখেন নি।

সন্দেহ নেই, ঠাণ্ডা যুদ্ধ, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ, মেরুকরণ, পারমানবিক যুদ্ধের আশংকা ইত্যাদি সব কারণগুলি অত্যন্ত জোরদার ব্যাপার ছিল সোভিয়েতের পক্ষে মানুষের সমবেত হওয়ার পিছনে। কিন্তু কোন দেশে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম আর সুপার পাওয়ার হিসেবে সোভিয়েতের বিদেশ-নীতির নানা ডাকে সাড়া দেওয়ার তাগিদ কি এক মাপকাঠিতে বিচার্য হবে? আরো পরে, যখন দ্বিতীয় সমাজতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে চীন বিশ্বরাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে সুরু করে, তখন চীনের ডাকে সাড়া দিয়ে যারা নতুন আলোয় পথ দেখতে শুরু করে, তারাও একই রকম ভুলের শিকার হয়। আসলে এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম কমিউনিস্ট আন্দোলনের তিন শাখা, সি পি আই, সি পি আই (এম) ও নকশালরা, কেউ কোনদিন করে নি। তাই স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে, দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন এগিয়ে তো যায়-ই নি, বরং পিছিয়ে পড়েছে। কল্যাণ দত্ত'র এই মত যে কোন পুরানো কমিউনিস্ট মুখে না হলেও মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য, সে কথা জোর দিয়েই বলা যায়।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের আলোচনা-সূত্রেই লেখকের আরেকটি কথা ভাবার মতো। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, স্বাধীনতা বা ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে যখন দেশের সামনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতারা একটামাত্র প্রশ্ন রেখে ছিলেন দেশটা অবিভক্ত থাকবে কিম্বা ভাগ হবে কিনা, তখন কমিউনিস্টরা সর্বশক্তি নিয়ে যদি দেশভাগের বিরোধিতা করতো, তাহলে দেশভাগের দায় থেকে উদ্ভূত দেশের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির দায় অন্ততঃ কমিউনিস্টদের নিতে হতো না। আজকের সমস্ত মৌলবাদী শক্তির জন্মলগ্ন সেই দেশভাগের রাজনীতির মধ্যে নিহিত। ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে সেই মৌলবাদী শক্তির মোকাবিলা করা কতো কঠিন, সমকালে তার প্রমাণ কেবল হিন্দি বলয়ে নয়, দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে এই রাজ্যের রাজনীতির সমকালীন চেহারার মধ্যেও তা ধরা পড়েছে। লেখকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, নাস্তিকতার জোর ধর্ম-নিরপেক্ষতার চেয়ে অনেক বেশি। একালে ক'জন কমিউনিস্ট বলতে পারবেন তিনি নাস্তিক?

আজকের কমিউনিস্ট আন্দোলন এদেশে এবং অন্যত্র যে নতুন করে গড়ে উঠতে পারবে, কল্যাণ দত্ত সে সম্পর্কে আশাবাদী। কারণ, তা না হলে তিনি বলতে পারতেন না যে, আজকের কমিউনিস্টরা কোন আপ্ত বাক্য মেনে চলে না, চলবে না। কোন মহানায়কের চিন্তা-অনুসারী হওয়ার তাগিদ তাদের নেই। কারণ, পথ নির্দেশ দেওয়ার মতো কোন মহানায়ক আর নেই। তাঁদের মূল্যায়ন ও অবমূল্যায়ন দুইয়েরই পর্ব চলেছে। তাই সমাজবিজ্ঞান হিসেবে মার্ক্সবাদের অনুশীলন আর তার প্রয়োগ, যা ঘটনার

গতি মানুষকে করতে বাধ্য করাবে, তার ভিত্তিতেই দেশ ও সমাজের বিশ্লেষণ থেকেই পথের দিশা পেতে হবে।

কল্যাণ দত্ত আত্মকথনের গর্বাচেভের সংস্কারের আলোচনা করেছেন বিস্তৃত ভাবে। হুকুমী ব্যবস্থা ভেঙে খোলা মেলা আলোচনা, গণতন্ত্রের প্রসার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে সিভিল সোসাইটি গড়ে তোলার দায়বদ্ধতা, যে কথা গ্রামশি বারবার বলেছেন, সেই সব তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ বিগত দেড় দুই দশক ধরে মার্ক্সবাদী মহলে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেই বৌদ্ধিক প্রেক্ষিত কল্যাণ দত্তকে এতোটা জোরের সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে জীবনকথার প্রতি ছত্রে দ্বিধাহীন ও মুক্ত-কণ্ঠ করেছে। আলোচকের এই মন্তব্য বেঠিক বা সঠিক যাই হোক না কেন, তাতে এই জীবনকথার অপরিসীম মূল্য কমে না। গর্বাচেভ সংস্কার নিয়ে লেখকের কোন কোন বক্তব্যের ভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা হতে পারে। এটা তার সঠিক স্থান নয়। পরিশেষে বলা দরকার প্রয়াত কল্যাণ দত্ত'র অনুরাগী, সুহৃৎ, এই আলোচক নিজেকেও যাদের একজন বলে মনে করে, তাঁরা সব কমিউনিস্টের ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। খোলা চোখে দেখা, খোলা মনে বিচার করা যে জরুরী কাজ, এখন সেটাই নতুন করে দেখা দরকার।

বাসব সরকার

আমার কমিউনিস্ট জীবন ঃ কল্যাণ দত্ত পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, দাম ৬০ টাকা

হওয়া না হওয়া মানুষের ইতি বৃত্তান্ত

"মোক একখান মানষির নাম দেন।"

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত। দেবেশ রায়।
পৃঃ ১৫৪, ১ম সংস্করণ।

সাহিত্যের কোনো বিষয় যখন নাটকের মঞ্চে দেখা যায়, তখনই দর্শকমন তার মধ্যে সাহিত্যের ছবি খোঁজে। নাটকে সাহিত্যের সেই রস ফিরে পেতে চায়। বিশেষতঃ বাঙালী মন সাহিত্য প্রধান। সাহিত্য আমাদের নিকটতম আত্মীয়। তাই গানের মধ্যেও সুরের চেয়ে ভাষাকেই খুঁজি।

নাটকের একটা পরম্পরা আছে। মঞ্চায়ণের সময় নাটক তার নিজস্ব গতিতে ছোটে। নাটক, সাহিত্যের চরিত্রকে অবয়ব দেয়। চরিত্র কথা বলে। তার হাসি-কান্না-রাগ-অভিমান সব মূর্ত করে অভিনয় দিয়ে। ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ঘটনার সংঘাতে নতুন ঘটনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাহিত্যের বর্ণনায় বিষয় সম্পর্কে একটা আবহ তৈরী হয় কল্পনালোকে। মনোযোগী পাঠক চোখের সামনে সাজিয়ে নেয় প্রেক্ষাভূমি। চরিত্রের কথামালা ও লেখকের বর্ণনা গেঁথে গেঁথে গড়ে তোলে ঘটনার বাস্তবক্ষেত্র। নাটক তা নয়, সাহিত্যের চরিত্রকে বাস্তব ভূমিতে দৃশ্যায়ণ করে নাটক। অভিনেতার হস্তাভিনয়, শরীরাভিনয়, বাগভিনয়ের মাধ্যমে নাটকে উপস্থিত হয়ে চরিত্রকে ঘোষণা করে। ফলে সাহিত্যের আলোচনা ও নাটকের আলোচনা দুটি পৃথক বিষয়। মাধ্যমের ভিন্নতা হেতু হয়ত সাহিত্যের সব কথা নাটকে বলা যায় না অথবা নাটকের ঘটনাপ্রবাহের পরম্পরা সাহিত্যে সে ভাবে আসে না।

মূল আলোচনা শুরুর আগে আমার এই গৌরচন্দ্রিকার কারণ একটু সংক্ষেপে বলে নিই। ৪ জুন ২০০০ রবীন্দ্রসদনে প্রথম মঞ্চস্থ হয় চেতনার সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। মাত্র দেড়-দুমাসের মধ্যে এই প্রযোজনাটি যেভাবে সমগ্র বাংলা নাটকের জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার নিহিতে শুধুমাত্র উচ্চমানের মঞ্চায়ণের সাফল্য নয়, উপন্যাসের মৌলিকতাই 'মূল' কারণ বলে মনে হয়েছে। ফলে এযাবৎ বিভিন্ন পত্র-

পত্রিকায় যতগুলো আলোচনা চোখে পড়েছে, তার বেশির ভাগ আলোচনাই উপন্যাসকেন্দ্রিক, বহুক্ষেত্রে শুধুমাত্র উপন্যাসের বিষয়বস্তুর আলোচনাও বটে। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি (সত্যজিৎ রায় কৃত) চিত্রায়ণের সমালোচনার সময়ও যে এরকম প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, তা ১৯৫৫ সালের 'পরিচয়'-এ পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের আলোচনা পড়ে জানতে পারি। আলোচক ছিলেন বিখ্যাত চিত্র সমালোচক চিদানন্দ দাশগুপ্ত। তাই এই নাটকের আলোচনার পূর্বে আমি তিনটি শর্ত লিপিবদ্ধ করতে চাই, যাতে কোনো সময় সমগ্র উপন্যাসের সূত্র ধরে আমার আলোচনা ভিন্নতর মনে না হয়।

এক. নাটক দেখার পূর্বে সমগ্র উপন্যাস পাঠ যেহেতু প্রাক্ শর্ত নয়, আমিও আলোচনায় সেই সুযোগ নিতে চাই।

দুই., নাটকে তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ঠিক ঠিক যেভাবে মঞ্চায়িত হয়েছে সেই পরিকাঠামোর মধ্যেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ। বাড়তি আগ্রহ নিয়ে উপন্যাসের বর্ণিত 'সমগ্র'কে আলোচনা নিয়ে আসি নি।

তিন. আমার আলোচিত অভিনয় ঃ ১২.৭.২০০০ আকাডেমী মঞ্চ। এবং যেহেতু একবারই দেখেছি অন্য মঞ্চের সঙ্গে অভিনয় ও মঞ্চসজ্জার তুলনা করতে পারব না।

নাটকটি বাঘারুকেন্দ্রিক। বাঘারুকে কেন্দ্র করে ঘটনার স্রোত তিস্তার স্রোতের মত উত্তাল বয়ে গেছে। কিছু খণ্ড খণ্ড ছবি, যেখানে আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত কোনো আখ্যান তৈরী হয় না। কিন্তু যেহেতু এটি একটি নাটক, তাই মঞ্চের একটা আদল নিতে হয়েছে (যেন অনেকটা বাধ্য হয়েই) । মঞ্চে ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্রের চলাফেরার রকমফের ঘটিয়ে ভয়ঙ্কর তিস্তাকে মঞ্চে আনতে হয়েছে। পারের সমাজজীবন, রাজনীতি অর্থনীতির ঝাপসা ছবিগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে নাটকের বিন্যাস রচিত হয়েছে এবং ক্রমশ সৃষ্টি হয়েছে ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের সমগ্র নাটক।

আসলে এ নাটক, বাঘারুর নীরবতা দিয়ে তিস্তার বিনাশী ভাঙনকে ধরতে চেয়েছে। বাঘারু প্রকৃতির সন্তান। সে প্রকৃতি কখনও তিস্তা, কখনও অরণ্য, কখনও বাথান কখনও ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঘারু এখানে চিহ্নিত হয় এক আদিমতার সমান্তরালে। আপাদমস্তক প্রশ্ন চিহ্নে মোড়া, কখনও অপার বিস্ময়। বাঘারু যে ঠিক কি, তা পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেল না নাটকের শেষেও। বাঘারুকে আমরা চিনলাম শুধুই নেতির মাধ্যমে অর্থাৎ যা যা সে নয়। বাঘারু অপারেশন বর্গার কেউ নয়, বাঘারু কৃষকের নয়, বাঘারু

শ্রমিকের নয়, বাঘারু মিছিলের নয়। শুধুই সে আধেয়বিহীন শূন্য আঁধার। অথচ বাঘারু নিজে জানে, সে গয়ানাথের। গয়ানাথ জোতদারের। সে জোতদারের ক্রীতদাস না হয়েও পিতার নাম গড়গড়িয়ে বলে গয়ানাথ। অর্থাৎ প্রকৃতির সন্তান বাঘারুর শরীর আছে। বিবেচনা তৈরী হয় নি। অর্থাৎ বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে কোনো এক অসম পর্যায়ে বাঘারুর অবস্থান।

বানর যখন হাতের ব্যবহার সঠিক ভাবে রপ্ত করতে শিখল এবং সোজা ভাবে দাঁড়াবার ভঙ্গি আয়ত্ত করল সেটাই ছিল মানুষ-এ উত্তরণের চূড়ান্ত পদক্ষেপ। 'হাত' শ্রম করাতে শেখাল, এরপর শ্রমের কারণেই কোনো এক পর্যায়ে এল 'কথা'র প্রয়োজন। এই প্রেরণা কণ্ঠনালীতে 'ধ্বনি' আনল। এইভাবে শ্রম থেকে এবং শ্রমের সঙ্গেই 'ভাষা'র উৎপত্তি হল। প্রথমত শ্রম, তারপর ও তার সঙ্গে কথা—এই দুটি হল প্রধানতম প্রেরণা যার প্রভাবে বানরের মস্তিষ্ক ও সহগ ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ, চেতনার ক্রমবর্ধমান স্বচ্ছতা এবং বিমূর্তিকরণ ও বিচারক্ষমতা, শ্রম ও বাক্‌শক্তির উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার ফলে শ্রম ও বাক্‌শক্তি উভয়েই ক্রমাগত 'বিবেচনা'র নিত্যনতুন প্রেরণা লাভ করে। বাঘারু মানব বিবর্তনের এই পর্যায়েই থেমে গেছে, আর তার বোধের বিকাশ ঘটে নি। কিন্তু বিবর্তনের ইতিহাস তো থেমে থাকেনি। তারপর 'সমাজ' সক্রিয় হয়েছে। সমাজজীবনে মানুষ হস্ত, বাক্‌যন্ত্র ও মস্তিষ্কের সহযোগিতায়, জটিল থেকে জটিলতর কাজ করার, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর লক্ষ্যস্থাপন ও সাধন করার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রকৃতির ওপর প্রভূত্ব করতে শুরু করেছে। প্রকৃতির চিরাচরিত গতিধারার মধ্যে আমাদের হস্তক্ষেপের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলাফল প্রকৃতির সন্তান বাঘারু মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। মানস ও বস্তু, মানুষ ও প্রকৃতি-র এই অর্থহীন বিরোধে বাঘারুর মনের কোনো এক কোণে অভিমান জমেছিল। শেষ দৃশ্যে কি তাই বাঘারুর ঐ পরিণতি? চারপাশের জগৎ যখন নিরন্তর বদলে চলেছে, তখন বাঘারুই যেন কেবল পিছিয়ে থাকে, অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে মানব বিবর্তনের ঐ অসম পর্যায়ে।

বাঘারু কোনো কিছুতেই নেই। না অপারেশন বর্গার কাজে, না মহিযবাথানের হাটে, না বন্যার জলে, না উত্তরখণ্ড কামতাপুরের মিছিলে, না তিস্তা ব্যারেজ,—না থেকেও যেন সব জায়গায় হাজির। তিস্তাপারের এমন কোনো ঘটনাই নেই, যার সঙ্গে বাঘারু জড়িয়ে না পরেছে। কোনো কিছু না হয়েও বাঘারু পৌঁছে গেছে সংঘাতের কেন্দ্রে। কারণ ঐ গয়ানাথ। গয়ানাথ তার মনিব। গয়ানাথের বাঘারু-উ-উ-উ চিৎকারে নিমেশে মঞ্চে এসে হাজির

হয় বাঘারু। গয়ানাথের নির্দেশে উড়ে যাওয়া মানচিত্র মুখে করে বয়ে নিয়ে সে নিজেই যেন হয়ে ওঠে গোটা নাটকের মানচিত্র।

নাটকের চালচিত্রে কিন্তু বাঘারু কেউ নয়। প্রথম দৃশ্যেই সুহাসের আগমন নাটকের বিবেচনা স্পষ্ট করে, তার বিগত জীবনের বামপন্থী (নকশালপন্থী) মূল্যবোধ দিয়ে। নাট্যকার এখানের সমাজ মূল্যায়ণের দিক-নির্ণয় সেরে নেন সুহাস অর্থাৎ সেটেলমেন্ট অফিসারকে দিয়ে। এর পর যা, সবই সুহাসের ম্যাপের কৌণিক নির্ণয়। একে একে আসে জমি বনাম জমির অধিকার। জোতহীন কৃষক বনাম জোতদার। সরকারী আমলা বনাম মূল্যবোধ ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝের ঘটনা বা ফলাফল জমির অধিকার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বর্গাসত্ত্ব যা দীর্ঘ বামপন্থী আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী ফল। তেভাগার 'লাঙল যার জমি তার' স্লোগানের পূর্ণ রূপায়ণ। সেটেলমেন্ট অফিসারের ভয়ে গয়ানাথের মত প্রভাবশালী জোতদারকেও লাঙল চালানো শিখতে যেতে হয় মাঠে, বলদগুলো চিনতে হয়—এটা তো শুধু নাটকের রিলিফ নয়, ট্রাজিকও বটে (রিলিফ বলছি এই কারণে, সেদিন অভিনয়ের ঐ মুহূর্তে চাপা হাসির গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল দর্শকাসন থেকে)। আমাদের স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণ ঘটে এখানে।

নাটকটি ভিন্নতা দাবী করে বিষয়ের দিক থেকে, ফর্মেরও। এর মূল চরিত্র, আবহ, সংলাপ, মঞ্চ সবকিছুতেই এমন একটা আপোষহীন বহুমুখিতা আছে, তা যে কোনো পরিচালকের পক্ষেই সামাল দেওয়া দুষ্কর। মনে হয় সারা বিশ্বেই এহেন নাটকের প্রযোজনা একটি বিরল ঘটনা। শুনেছি টলস্টয়ের 'দ্য পাওয়ার অফ ডার্কনেস' নাটকটি যখন স্তানিস্লাভস্কি প্রযোজনা করেছিলেন, তখন অভিনেতাদের নিয়ে দল বেঁধে গ্রামে বাস করেছিলেন। গ্রামের ভাষা রেকর্ড করে নিয়ে এসে অভিনেতাদের মহলা দিয়েও খুশি হতে পারেননি প্রযোজনার ক্ষেত্রে। এই নাটকেও ঠিক তেমনি বিষয় ও ফর্মের তীক্ষ্ণ সারল্যই দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাটকের ক্যানভাস বিরাট, প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার উপন্যাসকে পৌনে তিন ঘণ্টার নাটকের কাঠামোতে ধরাতে হয়েছে ঠিকঠাক, উপন্যাসের তাল না কেটে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসের পেটের ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে নাটক 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। ফলতঃই আকারে ছোট। মাতৃক্রোড়ে সদ্যজাতরা যেমন হয়, আকারে বড় না হয়েও অবিকল মায়ের মত ঠিক তেমনি।

নাটকটি বাঘারু-আখ্যান হয়ে ওঠেনি পরিচালক সুমনের চতুর বুদ্ধিদীপ্ত

নির্মাণে। উপন্যাসের দাবীতে বাঘারু চরিত্র ছিল অনিবার্য। অথচ নাটকের দাবীতে প্রয়োজন ঘটনা। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' এক জনজীবনের ইতিহাস। সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রতিমুহূর্তে তিস্তাপারের জনজীবনকে আক্রান্ত করেছে। আক্রান্ত হয়েছে প্রকৃতির দ্বারাও। একদিকে সমাজ বিপ্লবের রাজনীতি, অন্যদিকে খরস্রোতা তিস্তার গতি পরিবর্তন—বন্যা, দুয়ের মাঝখানে পারের জনজীবন দিশেহারা। প্রকৃতি ও উচ্চবর্ণের মানুষের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের দিনলিপির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল নাটকের রসদ এবং সেটাই বলতে শুরু করে হঠাৎই নাটকের ভরকেন্দ্রে চলে আসে বাঘারু। নতুন ঘটনা এনে বাঘারুকে সরিয়ে দিতে চান নাট্যকার। পারেন না। আবারও এসে যায়। এইভাবে ঘটনা দিয়ে দিয়ে বাঘারুকে সরাতে সরাতে নাটকের বিরতি নামে।

কিন্তু বিরতির পর আবার অন্য চিত্র। বাঘারু মঞ্চে স্থায়ী হয়ে যায়। কোনো ঘটনাই আর বাঘারুর অস্তিত্বকে টলিয়ে দিতে পারে না। তার বিশাল দেহ নিয়ে বাঘারু হয়ে ওঠে আরো বিশাল। আকাডেমীর ঐ মঞ্চে ঐটুকু নাটকের আদলে আর যেন আঁটে না। মঞ্চের মাথা ফুঁড়ে শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। তিস্তার বন্যায় যখন ভারত-বাংলাদেশের সীমানা ভেঙে গেছে, তখনও না। কারণ বাঘারু তখন নিজেই সীমান্ত লঙ্ঘনের সাধ পেয়ে গেছে। ঘটনার দর্শক এখন আর সে নয়; সেই ঘটনার নিয়ন্ত্রক। নাটকের প্রথম পর্বে সুহাস ছিল ঘটনার নিয়ন্ত্রক। নাট্য-ঘটনার বিবেক। বাঘারু এসে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল মাত্র। সুহাস দেখে গয়ানাথ জোতদারের সমস্ত হুকুম একজন নীরবে তামিল করে চলেছে। পরণে একচিলতে কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। সুহাস সনাক্তকরার চেষ্টা করে। কিন্তু বামপন্থী (নকশাল পন্থী) মেধা ও মননের অধিকারী জমি-জরিপের মস্তিষ্ক নিয়ে সুহাসের শুধু নির্বাক চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। সুহাসের এমন কোনো ভাষা জানা নেই যা দিয়ে কথপোকথনেও জেনে নিতে পারে তার অস্তিত্ব। সুহাস কতটা অসহায় বোঝা যায়। কিন্তু স্থানীয় এম-এল-এ-কে কাঁধে করে নদী পার করার সময় বাঘারুর সঙ্গে এম-এল-এ-র কিছু বাক্য বিনিময় হয়। অথচ এই এম-এল-এ-র পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর সৌজন্যটুকুও জানে না রীতিনীতি জ্ঞানহীন 'উজবুক' বাঘারু। তবুও বাঘারুর কিছুটা একাত্মতা ঘটে এই রামপন্থী এম-এল-এ-র সঙ্গেই। বামপন্থী (নকশালপন্থী) সুহাসের সঙ্গে নয়। এক্ষেত্রে অন্যান্য বামপন্থীদের তুলনায় নকশালপন্থীরা যে বহুলাংশে জনসংযোগবিহীন ছিল তা, বাঘারুও

আর একবার তার এই একাত্মতার পক্ষপাতিত্ব দিয়ে প্রমাণ করে দিল। বাঘারু জন্মবৃত্তান্ত, নামের বৃত্তান্ত সবই কেমন সুন্দর বর্ণনায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খতায় ও পুনরাবৃত্তিতে, শব্দকে ভেঙে ভেঙে, ছড়িয়ে ছড়িয়ে, কণ্ঠস্বরের ভঙ্গুর কারুণ্যে ও বন্ধ্যা অস্থিরতায় যেন সে শুধু এম-এল-এ-কেই শোনায় না, নিজেকেও শোনায়। প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ, চাবুকের মত আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে নিজেকেও, ...'মোক একখান মানষির নাম দেন।'

বাঘারুর বিবেচনা নেই। বাঘারু তাই অধিকার জানাতে শেখেনি। কিন্তু এম-এল-এ-র বিবেচনা আছে, সে গয়ানাথকে বলে বাঘারুকে তার বিশাল জমির কোন একটা অংশ বর্গাসত্ব দিতে, বাঘারুকে মানুষে উন্নীত করতে। কিন্তু গয়ানাথের তোপের সামনে বাঘারু পিছিয়ে যায়। 'মানুষকে সচেতন করার'—এম-এল-এ পদ্ধতি বাঘারুর ক্ষেত্রে কোনো ফল দেয় না। বাঘারু বাঘারুতেই থেকে যায়।

নাটকটা সত্যিই প্রাপ্তবয়স্কদের। এখানে নাটকের মূল চরিত্র বাঘারুর মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচিত চেহারা নেই। শুধু পরিব্যাপ্ত অন্ধকার। এক ঘটনার পর আর এক ঘটনা তিস্তার ঢেউ-এর মত আছড়ে পড়ছে বৃত্তান্তে। অভিনয়ের অনেকটাই ঘটে স্টেজের ঐ আলো আঁধারিতে। কোনো ফাঁক নেই, কোনো ফাঁকি নেই। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গ গড়গড় করে চলে আসছে মঞ্চে পাত্র-মিত্র নিয়ে। অভিনয়ের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে পড়ছে ঘটনা। অভিনয় ও ঘটনাকে আর আলাদা করা যাচ্ছে না। তেইশজন অভিনেতা পঁয়তাল্লিশ জন চরিত্রের অভিনয় করছেন।

নাটকটির জোর মূলতঃ উপন্যাস বর্ণিত বাস্তবতার জোরেই। সেই বাস্তবতার জগৎ এতই আমূল যে তা আঞ্চলিক পটভূমিতে রচিত হলেও আঞ্চলিকতা বা দেশের বেড়া প্রায় অবান্তর হয়ে গেছে, বাঘারুর আগমনে। গ্রামের জোতদার-বর্গাচাষীর সম্পর্কের যে সংগ্রামী অনুলিখন ঘটেছে, তিস্তাপারের দৈনন্দিন জীবনযাপনের যে দিনলিপি, সংলাপে মঞ্চে আবহে সৃষ্টি হয়েছে তা বাংলা নাটকে এত অবিকলভাবে আগে এসেছে কিনা সন্দেহ। প্রতিটি অভিনেতার পদক্ষেপণে, সঞ্চালনে, প্রায় নগ্ন পোশাকে কিম্বা গায়ের চামড়ায় মাটি-জমা বিবর্ণতায় ঐ কর্কয, লালিত্যহীন বাস্তবতাকে মঞ্চে যেভাবে হাজির করেছেন পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায় তা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। মদেশিয়া ভাষায় সংলাপ উচ্চারণে কোনো আপোষ করা হয়নি। দর্শক-শ্রোতাদের বোধগম্যতাকে ভ্রূক্ষেপ না করে তা অনর্গল

উচ্চারিত হয়েছে। বাস্তব জীবনের মতই সংলাপ কখনও জটিল, কখনও খুব আলগা, কখনও শ্রুতির খুব কাছে, কখনও আড়ালে। রূঢ় বাস্তবতাকে এরকম প্রবলভাবে হাজির করার দুঃসাহস দেখে মনে হয়েছে হয়ত উপন্যাসের মেজাজটাকেই ধরতে চেয়েছেন। এইরকম বেপরোয়া প্রকাশের জন্য দর্শকদেরও প্রস্তুত হয়ে দেখতে আসতে হবে। নয়ত আমার মত ভাষাবোধের রুগ্নতার কারণে সব রস নাটক থেকে নিংড়ে নেওয়া যাবে না।

প্রকৃতি ও সভ্যতার সহাবস্থান ও বিরোধ এই নাটকের আবহ। মঞ্চের প্রতিটি আসবাব ধাতুর। অভিনেতাদের দুরন্ত গতি যা তিস্তার জলে আছড়ে পড়ে, উথাল পাতাল করে দেয় গোটা মঞ্চ। তাকে সামাল দিতে মঞ্চ হয়ে উঠেছে পাকা পোক্ত। কিন্তু বাঘারুর আঙ্গিক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অভিনেতারাও হয়ে ওঠে খরস্রোতা তিস্তা। ফলে মঞ্চ স্থায়ী হয় না। ধাতু নির্মিত চৌকির অবস্থান পরিবর্তনে কখনও সে হয়ে ওঠে অরণ্য, কখনও হাট, কখনও জলস্রোত। ধাতু নির্মিত গাছের আদল অভিনেতাদের শরীর ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনও তাদের নির্দেশে হেলে যায়, দুলে যায় হাওয়ায়, কিন্তু ভেঙে পরে না কখনও। মঞ্চ সৃজনের ভাবনায় শিল্পী হিরণ মিত্রকে না জানি কোন বি-নির্মাণের ভাবনা পেয়ে বসেছিল। নয়ত নাটকের মধ্যে অতবার মঞ্চ ভেঙে মঞ্চ গড়া হল, এবং প্রতিবারই নাটকের খাপে খাপে মঞ্চটা সঠিকভাবে গড়ে উঠল, একবারও বিঘ্ন ঘটল না। এমনকি শেষ দৃশ্যে ধাতুনির্মিত চৌকিগুলো কেমন সহজে তিস্তা বাঁধকে নিমেষে দৃশ্যমান করে দিল নিখুঁত আয়ত পরিমাপে। অন্যান্য মঞ্চ সামগ্রী যেমন হলকা ক্যাম্প, গয়ানাথের বাড়ি, সার্ভের যন্ত্রপাতি সবই অতি সাধারণ। এমনকি বাঘারুর মাথার চলমান চেয়ারও যেন সদ্য রথের মেলা থেকে কেনা অতি সাধারণ।

নাটকের শুরুতেই পেছনে কালো পর্দার সামনে চার-নরী হারের ছন্দে এক বিশাল গ্রন্থি ঝোলানো। তিস্তার প্রকাশ ভাবনা যে ঝুলন্ত গ্রন্থি হতে পারে, তা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারিনি প্রথমে। কিন্তু কোনো একসময় হঠাৎই দুরন্তভাবে দুলে ওঠে তা। আলো আঁধারিতে নদীর স্রোত বলে ভ্রম হয়। তখনই মনে আসে এইতো সেই গ্রন্থি যা খরস্রোতা তিস্তাকে অবয়ব দিয়েছে। মনে মনে বাহবা না দিয়ে পারি না সৃজনকর্তাকে।

মঞ্চসামগ্রী ও মঞ্চে উপনীত অভিনেতাদের সতত সঞ্চারমান গতিকে আলোকবৃত্তে যথাযথ প্রকাশ করাই আলো প্রক্ষেপকের লক্ষ্য। অভিনেতাদের মুড ও সময়কে প্রকাশ করার একমাত্র অবলম্বন আলো। আলোক শিল্পী

দীপক মুখোপাধ্যায় এক্ষেত্রে বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে হাঁটেন নি। গতানুগতিক আলোকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বাভাবিকত্ব এনেছেন নাটকে। তবে বহুক্ষেত্রে টর্চের ব্যবহার ভালো লাগে। নদীর উথাল পাথাল ঢেউ বা বন্যার দৃশ্যে নতুন সৃজনের সুযোগ ছিল। তা না করলেও অবশ্য নাটকের কোনো হেরফের হয়নি। করলেও যে তার ফলে নাটক কোনো নতুন মাত্রা পেত তা বলা মুশকিল।

নাটকের অন্য সহযোগী হল আবহ সঙ্গীত। এক্ষেত্রে দেবজ্যোতি মিশ্র-র সঙ্গীত ধারণা আধুনিক। তিস্তাপারের কাহিনীতে গ্রাম প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু গান শুধুই গ্রামীণ, লোক-সুরের হয়নি। নাটকের 'মুড' অনুযায়ী গানের সুর ব্যবহৃত হয়েছে। গতানুগতিক নয়।

বাঘারু শঙ্কর দেবনাথ-এর অভিনয় নাটকে নির্ভুল, লক্ষ্যভেদী। বাঘারুর চরিত্রর সঙ্গে তিনি যেভাবে একাত্মতা স্থাপন করেছেন তা এ যাবৎ বাংলা নাট্যমঞ্চে আমি দেখিনি। এই চরিত্রের রূপান্তরের ধরণ, তাঁর সাধাসিধে নির্বাক অস্তিত্ব, গয়ানাথের হুকুম তামিল করতে করতে বিধ্বস্ত ক্লান্তি, পলকে পলকে মুখাবয়বের পরিবর্তন দেখে আমাদের বিস্ময় জাগে। গোটা মঞ্চ জুড়ে ছটপটানি, ওলোট-পালট খাওয়া, শরীরকে আরো নির্দয়ভাবে ভেঙে চুরে যন্ত্রণাকে দৃশ্যগ্রাহ্য করে তোলা, মাঝে মাঝে শোয়ার ভঙ্গীতে পায়ের মুদ্রায় নৃত্যের ঝঙ্কার, তাঁর গোঙানি, আর্তনাদ দর্শকদের নির্বাক করে দেয়। নাটকের শেষে সমস্ত যন্ত্রণা ছেনে উঠে আসে সুদূরের অভিযান। হারিয়ে যাওয়া ছেলে 'সুমন দেবনাথ'কে মাথায় নিয়ে অবলীলায় নাটক থেকে হারিয়ে যান। আমাদের ভালোলাগা মনও কেড়ে নিয়ে যান বাঘারু শঙ্কর দেবনাথ।

এভাবে একক অভিনয়ের উল্লেখ করলে সমগ্র নাটককে কিন্তু ধরা যাবে না। কারণ সমষ্টিগত অভিনয়-ই নাটকটির প্রাণ। একক অভিনয় নয়। বাঘারুর চরিত্রাভিনেতা একটু কমজোরী হলেও যে নাটকটির প্রযোজনা-মানের ক্ষেত্রে ইতর বিশেষ কিছু হেরফের ঘটত বলে আমি মনে করি না। কারণ তিস্তাপারের বাস্তবতা সমষ্টিগত অভিনয়ের জোরে যেভাবে মুদ্রিত হয়েছে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। আর বাঘারু বাদে বাকি জনা পঁচিশ অভিনেতা তাঁরা তো শুধু চরিত্রাভিনেতাই নন, তাঁরা একাধারে মঞ্চকারিগর, অন্যধারে মিছিলের লোক, হাটের ক্রেতা-বিক্রেতা, বানভাসি মানুষজন ইত্যাদি ইত্যাদি। সব তাঁরা। তাঁরাই নাটকটির মঞ্চসাফল্যের প্রধান সম্পদ। তাঁদের প্রত্যেকের হাঁটাচলা যেন সামরিক রেজিমেন্টের ছন্দে। তাঁদের সমবেত আর্তনাদ, কোলাহল যেন মূর্ত আবহ। ঐ সব নাম না জানা চরিত্রের দীর্ঘ অনুশীলন-রপ্ত ছন্দময় পদচারণা ব্যতিরেকে ঐ বিরাট

ক্যানভাসের নাটকটি সম্পূর্ণতা পেতে পারে না। তাঁরা প্রত্যেকেই অভিনেতার যোগ্য সম্মান পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

তবুও নাটকের প্রয়োজনে যে সমস্ত চরিত্র পৃথকভাবে দর্শকদের প্রভাবিত করতে পেরেছে তাদের মধ্যে গয়ানাথ (গৌতম মৃধা) ও সুহাস (সুপ্রিয় দত্ত) উল্লেখযোগ্য। গ্রামীণ জোতদার গয়ানাথের সরল গ্রাম্যতা, আঞ্চলিক ভাষার রপ্ততা, 'বাঘারু-উ-উ' ডাক দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে। সেটেলমেন্ট অফিসার সুহাসের সংযত মার্জিত অভিনয় গ্রামীণ ও নগরের কথন পার্থক্যকে সুন্দরভাবে চিহ্নিত করে। তবে ঐ চরিত্রাভিনেতার কম্যান্ডান্ট চরিত্র চিত্রায়ণ একটু উচ্চকিত। যেন এই নাটকের গোটা বাচনছন্দ থেকে একটু বেশি মাত্রায় বেমানান। দুটি চরিত্রকে হয়ত ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ করার তাগিদেই তিনি ঐ ভঙ্গী বেছে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে আশ্বস্ত করে বলি, নাটকের সমস্ত চরিত্রই এমনভাবে স্বমহিমায় পৃথক যে ভিন্ন ভিন্ন অভিনয়রীতির মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয় না। পরিচালক সুমনকে একটু ভাবতে অনুরোধ করি। লটারিওয়ালার হাতে মাইক প্রয়োগ সুমনের উদ্ভাবনী শক্তিকে আরও নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং অভিনেতা জয়রাজ ভট্টাচার্য তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে তাঁকে আরো স্ফুরিত করেছেন। ভীড়ের দৃশ্যে বরুণ মৈত্র বহুবার নজর কেড়েছে তাঁর ঝাঁকড়া চুল ও বেতের মত প্রায়-উলঙ্গ চেহারার জন্য। কিন্তু নাটক আলাদাভাবে চিনতে দেয়নি তাঁকে। কারণ তাঁর নাম তখনও তৈরী হয়নি। কিন্তু 'কাদাখোঁয়া' হিসেবে যখন আমাদের কাছে চেনা দিল তখন সেই মুহূর্তে মনে হল তার নির্বাক অভিব্যক্তি বাঘারুকেও ছাপিয়ে গেল যেন। চরে আটকে পরা বাঘারুকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে মঞ্চের গভীরে যেভাবে দুজন দুদিকে দাঁড়িয়ে থাকল নিথর কিছুক্ষণ, বাচিক অভিনয় ব্যতিরেকে, সেই মুহূর্তটিকেই মনে হয়েছে গোটা নাটকের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। না, বাঘারুর একক অভিনয়ের মুহূর্তগুলোও না।

এতক্ষণ তিস্তাপারের বৃত্তান্ত নাটকের ভাললাগা ও প্রায়-ভাললাগার বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেছি। কিন্তু সমস্ত মনেরও তো দুটো দিক থাকে, তা মেধার ব্যপ্তি যাই হোক না কেন। এক্ষেত্রেও তাই নাটকের বৃত্তান্ত বিষয়ে কিছু প্রশ্ন চিহ্ন আছে, তা ব্যক্ত করতে না পারলে নাটকের আলোচনায় আমার সততা প্রকাশ পাবে না এবং সেটা নাটকের আলোচনার ক্ষেত্রে আমার অসম্পূর্ণতায় প্রমাণ হবে।

আচ্ছা, এমন একটি নাটক কি ভাবা যায়, যার ঘটনা শুরু এই শতাব্দীতে আর শেষ? জানি না কোথায় হতে পারে? তাহলে নাটকের নায়ক বাঘারুকেও যেতে হবে শতাব্দী পেরিয়ে...। আর শতকব্যাপি সারাটা জীবনের অস্থিরতা প্রতিকূলতার প্রতীকে তার জন্মভূমি তো উত্তর বাংলা,

তিস্তা যেখানে পার ভাঙে, ঢেউ-এর শব্দে যার ঋতু বদলায়, একচর ডোবে, নতুন চর জেগে ওঠে, তার গায়ে লাগে চরের জলধোয়া শ্যামলিমা, নতুন সবুজের গন্ধ। বাঘারু জানে না ভালোবাসা কি? আর দেশ কি? অরণ্য, নদী, মাটি এই তার আদি জন্মভূমি। সে তিস্তার সন্তান, মানে অরণ্যের সন্তান, মানে মাটির সন্তান, মানে প্রকৃতির সন্তান। তবু সে 'টারজান' নয়। কারণ টারজানের কোনো 'গয়ানাথ' ছিল না। প্রকৃতির সন্তান হয়েও বাঘারু বেড়ে ওঠে সমাজের মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে, ভূমি আন্দোলনের মধ্যে। তবু সবকিছুর মধ্যে থেকেও যেন না থাকা। তবে কি সে 'ফ্যানটাসি' চরিত্র? যদি হয় তবে সমভাবে তো তা মেলে না। কারণ সে তিস্তাপারের সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে এসে যায়, অবলীলায়। যখন আসে তখন সে বাস্তব। গয়ানাথে আধুনিক কৃতদাসও মনে হয় মাঝে মাঝে। তার যে কোনো বিবেচনা নেই তা সমগ্র নাটকে প্রমাণের চেষ্টা থাকে। যদি তাই হয়, তবে এম -এল-এ-র কথপোকথনের সময় তার আত্মসঙ্কটের আর্তি বেড়িয়ে আসে কেন? সে এতক্ষণ আর্তনাদ করেছে। আর্তনাদের জন্য কোনো বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আত্মসঙ্কটের আর্তির জন্য তো বোধের প্রয়োজন। তাহলে নিশ্চয় সে বোধহীন উজবুক নয়, যেভাবে নাটকে চিত্রিত হয়েছে। এই বোধহীনতা ও বোধের সীমান্তে দাঁড়িয়ে সে কি নাটকের মূল ভাবনার সীমান্ত লঙ্ঘন করতে চায়? নয়ত 'মোক একখান মানষির নাম দেন'—কথাটা তার মুখে উচ্চারিত হয় বোধের কোন স্তরে? বাঘারু চরিত্রটি যে কি তা স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যাত হয় না। সে যদি মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের পূর্বে আলোচিত ঐ অসমপর্যায়ে থেকে থাকে, তবে সে তো প্রাগৈতিহাসিক মানবগোষ্ঠীর শেষ প্রতিনিধি। বর্তমানের কেউ নয়। তাই নাটক তাকে বারবারই বাইরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং সে বারবারই কোনো না কোনো অছিলায় নাটকের ভেতরে চলে আসে। তাতে সে কি বার্তা বহন করে? তবে কি বাঘারু শুধুই নেতি? এই নেতির মাধ্যমে বাঘারু চরিত্রের ইতি টানতে গেলে চরিত্রের পূর্ণতা পায় না। তার মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারের একটা ক্ষীণ চেষ্টা আছে। তখনই তাকে একটু রক্তমাংসের মানুষ মনে হয়। বাকী সময় ফ্যানটাসি। প্রথম থেকেই তাকে প্রকৃতি ভেবে নিলে গোলমাল তেমন বাঁধে না। প্রকৃতির সন্তানের রূপকে সমস্ত ঘটনাই যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে ব্যাপক অর্থে। যেমন তিস্তাপারের সমাজ অর্থনীতি-রাজনীতির কলুষতাকে একা বাঘারু নীলকণ্ঠের মতো পান করেও প্রতিবাদী হয় না, প্রকৃতির চারিত্রিক উদারতায়। সমাজ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণও ঐ যুক্তিতে খুঁজে পাই। নাটকের শেষে বাঘারু মরে না। বাঘারু চলে যায় অরণ্য পেরিয়ে, জ্যোৎস্না পেরিয়ে, নদী পেরিয়ে অন্য ভুবনে। প্রকৃতিও যেমন ধ্বংস হলেও মরে না, প্রকৃতির পাশ দিয়ে গজিয়ে ওঠে নতুন প্রকৃতি।

ঠিক তেমনি বাঘারুর পাশ দিয়েও গজিয়ে উঠেছে আর এক বাঘারু। প্রকৃতির মত বাঘারুরও কোনো ঘুম নেই। নিদ্রা নেই। গন্তব্য নেই।

কিন্তু এই ব্যাখ্যার চৌহদ্দিতে তো গোটা নাটকের বাঘারুকে আটকানো যায় না। যখন সে গয়ানাথের বাঘারু হয়, যখন সে এম-এল-এ-র বাঘারু হয়, আবার চরে আটকে গেলে যে তাকে উদ্ধার করে সেই কাদাখোঁয়ার বাঘারু হয় যখন। বাঘারুরই প্রতিবিম্ব যেন সে। ঘটনাচক্রে খুব কাছাকাছি আসে দুজনে। কিন্তু তাদের ভেতরে কোনো কথা তৈরী হয় না। সমগ্র বাঘারুর বিচারে এ আচরণও মেনে নেওয়া যায় না। নাট্য বৃত্তান্তে বাঘারুর এই চরিত্র চিত্রণে সুচতুর মেধার প্রয়োগ আছে। চরিত্র সৃষ্টির নিরিখে বাঘারুর না-মানুষ, না-প্রকৃতি হয়ে ওঠার প্রয়াস বাঘারু কোনো মতই বহন করবে না। বহন করতে হবে বৃত্তান্তের স্রষ্টাকে। আর স্রষ্টা যদি গোটা বৃত্তান্তে বাঘারুর অবস্থানকে শৈল্পিক বর্ণনায় শুধুই মায়াজাল সৃষ্টি করে গোটা বৃত্তান্তের আলোচনা বাঘারুতে কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য করেন, তবে আমাদের বড় অসহায় মনে হয়। তিস্তাপারের জনজীবনের ইতিহাস পাঠ করেও আমাদের মননের দিক্‌নির্ণয়ও কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। আমরা অপেক্ষায় থাকি বাঘারুর নতুন বিবেচনার।

সবশেষে একটা কথা না বললে নাট্য মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে অপরাধী মনে হবে, তা হল কামতাপুর, উত্তরখণ্ড আন্দোলনের নাট্যমুহূর্ত।' উত্তরখণ্ড কামতাপুর আন্দোলনের মত জটিল বিষয়কে নাটকে এককথায় 'জোতদার শ্রেণীর সৃষ্ট আন্দোলন' বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে তা ঐ বিষয়ের প্রতি সুবিবেচনা দাবী করে না। আর মূল উপন্যাসে অনেক ছোট ছোট বৃত্তান্তের মত ঐ আন্দোলন বৃত্তান্ত (দু মিনিটের জন্য) মঞ্চে না আনলে গোটা নাটকে তেমন প্রভাব পড়ত না। আর যদি নাট্য-বিন্যাসকার সুমনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রমাণের কারণে ঐ প্রসঙ্গ এমনই অনিবার্য ছিল তবে বিষয়টির আর একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এমন ক্ষণিকের উপস্থাপনায় যা সম্ভব হয়নি।

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

প্রাক্-সত্তর

'পরিচয়'

কে

শুভেচ্ছা

জনৈক শুভার্থী